একক 4 ❑ ভারতবর্ষের ইতিহাস : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

4.1 সারসংক্ষেপ

4.2 বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

4.3 সম্ভাব্য প্রশ্ন

4.4 গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ সারসংক্ষেপ ঃ

ভারতবর্ষের বুকে বহিরাগত শত্রুর যে রক্তাক্ত সংগ্রাম, সেই ইতিহাসের বিবরণে ভারতবর্ষের স্বরূপ নির্ধারিত হয়নি। সেখানে চরম দুর্যোগের কাহিনী থাকলেও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনস্রোতের ক্রমপ্রবাহিত সচল ধারা উপেক্ষিত হয়েছে। বিদেশীর লেখা ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধবিগ্রহ ও জয় পরাজয়ের কাহিনীই প্রধান, সাধারণ মানুষের সমাজজীবন সেখানে অনুপস্থিত। ভারতবর্ষের অন্তরধর্মের সমৃদ্ধ সম্পদের কথা লেখা হয়নি সেই বিবরণে। রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধানী দৃষ্টি, রক্ত(য়ী সংগ্রামের বার্তাকে গুরুত্ব দেয়নি, পরিবর্তে সমাজের অন্তর্নিহিত গতি নানা পথ ধরে চলার মধ্য দিয়েও একটি পরিবর্তনশীল এবং সহনশীল মানসিকতা গড়ে তুলেছে তাকেই তিনি প্রকৃত ভারতবর্ষ বলে মনে করেছেন, যদিও সেই কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নেই। কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম— এঁরা কেউই বিদেশীর লেখা ইতিহাস উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এঁরা সকলেই সেই সমাজ রূপান্তর কাজে সত্রি(য় হয়েছিলেন তাঁদের প্রজ্ঞ, ত্যাগ ও ধৈর্য নিয়ে। এইটি ভারতবর্ষের যথার্থ চেহারা, সেইখানেই আমদের নিজস্ব সত্তার আশ্রয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী শিকড় যে বহুদূর প্রসারিত, সে কথা আমার ভুলতে বসেছি। যারা ভারতবর্ষকে বাহুবলে গ্রাস করেছে, সেই আগন্তুকদের আমদানি করা সংস্কৃতি আমরা পরম সমাদরে গ্রহণ করেছি, মনে ভেবেছি ভারতবর্ষ যেন বন্ধ্যা প্রকৃতি। এই অশিক্ষার অগৌরবকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে স্বদেশের ইতিহাসের প্রাধান্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার পরিবর্তে দিগ্বিজয়ী মামুদ থেকে আরম্ভ করে লর্ড কার্জন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীর উদ্ধত গতিভঙ্গি তার অন্তর্গত হয়েছে; অন্তরালে চলে গেছে ভারতবর্ষের গৌরবময় যুগের ঘটনাগুলি। মুসলমান যুগে নবাবের বিলাসকক্ষ, নর্তকীর নুপুরধ্বনি, বৈভবের অহংকার, এগুলি কী সত্যই ভারতবর্ষের পরিচয় দেয়? তারপর এসেছে ইংরাজ শাসন, যে যুগে আমরা মনে করেছি ইংরাজের সবকিছু অনুকরণ করে মনের সংগ্রহশালায় তাদের সামগ্রীকে সঞ্চয় করা এবং তাতেই জীবনের পরম সার্থকতা ভেবে ধন্য হয়েছি।

দেশ এবং জাতিভেদে ইতিহাসও সর্বত্র এক নয়। পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করতে না পারলে ইতিহাসের উপাদান যথেষ্ট হল না বলে অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বলেছেন— ''যিশুখ্রীস্টের হিসেবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহার অন্য বিষয়ে সন্ধান করলি খাতাপত্রসমস্ত নগণ্য হইয়া যায়।'' ভারতবর্ষের প্রাণসত্তাকে রাষ্ট্রীয় ঘটনার উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে দেখলে, সেখানে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়। ইংরেজ সন্তান তার ইতিহাস থেকে পূর্বপুরুষের যুদ্ধ জয় ও বাণিজ্যবিস্তারের কাহিনী জানতে পারে। আর ভারতবাসী সেই পথ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে এক হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়, কারণ ইংরাজের মতো বাহুবল ও ধনবলের অধিকারী সে নয়। আমাদের দেশের ইতিহাসপাঠ সেই নঙর্থক দিকটি তুলে ধরা হয়। পরিণামে ''ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা পাই তাহাতে প্রতিদিন

দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া ক্রমে দেশের বিরুধে আমাদের বিদ্রোহভাব জন্মে।'' দেশের স্বরূপ যুক্তি(দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, সংজ্ঞার দ্বারা তার নির্ণয় হয় না। দেশীয় ভাবের ধারা শিশুকাল থেকে চিত্তবিকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে। সেই উপলব্ধি এক অখন্ড ঐক্যসত্তা গড়ে তোলে, যার দ্বারা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত এর ধারাবাহিক জীবনচেতনা মনের গভীরে প্রোথিত হয়। এইখানেই ভারতবর্ষ আপন গৌরবে উজ্জ্বল, যেখানে লেখা যাবে অসংখ্য বিভেদকে আত্মস্থ করে এক ঐক্যবিশ্বাস, সেখানে কেউ ব্রাত্য নয়, সকলের নিজস্ব সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষ তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। তার আগ্রাসী ভূমিকা নয়। এই বিরোধের ভাবকে অস্বীকার করার জন্যই ভারতবর্ষ তথাকথিত রাষ্ট্রগৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার প্রধান লক্ষ্য সম্প্রীতিবোধ। ''পরের বিরুধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলটিকাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যসংস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।''

এই প্রসঙ্গেই এক তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে দ্বন্দ্বসংঘাত ইউরোপীয় সভ্যতার মূল চিহ্ন, সেই জালে অন্য দেশের গলায় ফাঁস লাগলেও ইউরোপ তাতে লাভবান নয়। কারণ তাদের নিজেদের দেশেও সর্বস্তরের মানুষ নিজের অধিকারের ভিত্তিতে সমাজমানসকে সমৃদ্ধ করে না, বরং প্রতিকূল মনোভাবই সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায়, সেখানে শুধুই বলবৃদ্ধির উদ্যম। আইনের বলপ্রয়োগে সেখানে জনশক্তিকে আয়ত্তে রাখতে হয়। ''কারণ, বিরোধ যাহার বীজ বিরোধই তাহার শস্য, মাঝখানে যে পরিপুষ্ট পল্লবিত ব্যাপারটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই বিরোধ শস্যেরইপ্রাণবান বলবান বৃক্ষ'' অপরদিকে ভারতবর্ষের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সবরকম বৈপরীত্যকে আকর্ষণ করার মহৎ প্রয়াস। কিন্তু ঐক্যপ্রচেষ্টা শুধু আবেগ দিয়ে সার্থক হয় না, আইনও সেখানে কার্যকরী নয়। সেখানে ''যাহারা এক হইবার নয় তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায়— তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। ইউরোপের ইতিহাস লক্ষ করে বলছেন রবীন্দ্রনাথ যে সেখানে রাজশক্তি, প্রজাশক্তি, ধনশক্তি, জনশক্তি সব কিছুই জোর করে সম্বন্ধস্থাপনের ঘটনা; ফলে অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদ নেমে এসেছে প্রলয়ের পথ ধরে। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐক্যবন্ধ করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপের মতো সর্বদাই শক্তির প্রতিযোগিতায় সমস্ত জীবনাচরণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি, সেখানে নিজের অধিকারের সীমা লঙঘনের প্রবণতা দেখা দেয়নি। ভারতবর্ষে ঐক্যবন্ধন ঘটেছিল স্বতন্ত্র পথে। ''ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্রকর্মের উপযোগী করিয়াছিল, নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই।....ঐক্য নির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।''

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাকে অনুসরণ করে এই লক্ষ্যকে নির্ণয় করেছেন। যুগযুগান্ত থেকে বহুবিচিত্র মানুষের পদক্ষেপ যে ঘেটেছে ভারতবর্ষের মাটিতে, কিন্তু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐক্যসম্বন্ধযুক্ত সভ্যতা বিরোধ ডেকে আনেনি। তার ভিত্তিমূলে রয়েছে গভীর সহনশীলতা, আয় অনার্য কেউই অনাদৃত হয়নি। কিন্তু এই স্বীকৃতিতে যথেচ্ছাচারও ঘটেনি পশুসমাজের মতো। ভারতবর্ষের অন্তরাস্থিত শৃঙ্খলার বিধানে ''ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বন্ধ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইউরোপীয় জীবনাচরণ এই শৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত নয়(বহিরাগত দূরের কথা, নিজেদেরই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে তারা যথোচিত স্থান দিতে পারেনি। এমনকি অনেক দেশেই পদার্পণ করে ইউরোপ সেখানকার সভ্যতাকে প্রচন্ড আঘাত করে নিজেদের সমাজে মুখরক্ষা করতে চেয়েছে। ভারতবর্ষ পরকে বিতাড়ন করেনি, তার সভ্যতাসংস্কৃতিকে বিনষ্ট করেনি, শৃঙ্খলার

মধ্য দিয়ে নিজের জীবনাচরণের অঙ্গীভূত করার প্রয়াস রেখেছে। সুসংহতভাবে মনুষ্যত্বকে ধারণ করাই ধর্ম, সেইটিই মানবসভ্যতার লক্ষণ, সেই প্রেক্ষাপটেই ভারতবর্ষে মানবমনের পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপনের প্রণালী গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে, এই কর্মসাধন সম্ভব নয়। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'—গৌরবময় ভারতবর্ষের মহৎ প্রতিভাই এ কাজের যোগ্য। সাকার নিরাকার দুই উপলব্ধি সে ধারণ করে আছে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরও বীভৎস সামগ্রী অন্তরে গ্রহণ করে তাকেও আধ্যাত্মিক মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। বর্জন নয়, গ্রহণেই ভারত-আত্মার তৃপ্তি।

ইতিহাস পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেমন রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বে সমাজব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছেন তেমনি আবার ধর্মনীতিতেও সেই একই অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধন দেখা গেছে। ইউরোপের রিলিজিয়ন শব্দের যে অর্থে ব্যবহার ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেনি। সেখানকার জীবনের সামগ্রিক রূপকে গ্রহণ করাই তার ধর্ম। ইউরোপের মতো তা 'পোষাকি' ও 'আটপৌরে' রূপে দ্বিখন্ডিত নয়। পরিহাস করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন—'হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গীর্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই।" ধর্মকে তিনি বলছেন—'মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতি।" নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে মিলনের আদর্শকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করানোই ইতিহাসের কাজ, তার মধ্য দিয়েই বহুর মধ্যে একক অনুভব করার শক্তি নিয়ে অতীত থেকে বর্তমান এক নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হবে, যোগসূত্রটি অব্যাহত থাকবে। বিদেশের শিক্ষায় এই ধারাবাহিকতা নেই। কিন্তু না থকলেও একটি মহৎ অভিপ্রায় সেখানে আত্মগোপন করে আছে। বিচ্ছেদ না থাকলে মিলনে পূর্ণতা আসে না। বিদেশের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের শিক্ষাবিধির মধ্যে সংযোগ ছোট করতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে স্বদেশের সঙ্গে এক গভীর প্রীতির বন্ধন।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে এখন আমরা সেইরকম ইতিহাসবিদ চাই যিনি দিগ্বিজয়ীর জয়ের বার্তার পরিবর্তে এক অখণ্ড ভারতবর্ষকে তুলে ধরবেন তার অন্তরের শ্রদ্ধা নিয়ে। প্রয়োজনে কঠোর তিরস্কারে আমাদের জাতীয় চরিত্রের হীনমন্যতা দূরে নিক্ষেপ করে, উদ্ভাসিত করবেন বৈরাগ্য কঠিন প্রাচীন ভারতের উজ্জ্বল মাহাত্ম্যকে। সেই পথে বাণিজ্য নেই, শিক্ষার আড়ম্বর নেই, কিন্তু প্রাচীন সম্পদ নিয়ে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, সেই ভারতকে আমাদের জানতে হবে এবং জানাতে হবে। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে মানুষের গ্রহণ করার অধিকার তখনই হয়, যখন তার দেবার মতো সম্পদও থাকে। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবসত্তাকে উন্মোচিত করে তাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য ঐতিহাসিকের কাছে তিনি একান্ত প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ইংরাজের জ্ঞানবুদ্ধির যে বিপুল অহংকার, তার দ্বারা ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করা যায় না, কারণ সেখানে আত্মম্ভরিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঘোর অশ্রদ্ধা। এ যেন নিঃস্ব ভারতবাসীকে ভিক্ষাদান, তাদের সমতুল্য কেউ নেই, সুতরাং তাদের দানের প্রতিদান সম্ভব নয় এমন অবমাননার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের সন্তান বড় হচ্ছে। কিন্তু ইংরাজসন্তানের শিক্ষাবিধি তার মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে সাহায্য করে। তাদের শিক্ষা নিছক পুঁথিগত নয়, "তাহারা আলোক আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাদের সুদূর কালের সম্বন্ধ নহে।" কিন্তু এখানে সবই বিপরীত ধারায় চলে। সেই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও যদি কোনো ভারতসন্তান কিছু শিক্ষা পেয়ে তাকে ব্যবহার করতে পারে, তবে সেটি তার নিজের ক্ষমতার দ্বারাই লভ্য হয়েছে।

এই অসম্মান থেকে বাঁচতে হলে শিক্ষাদানকে বিদেশীর হাত থেকে নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। শিশুকাল থেকে হৃদয়ের শ্রদ্ধার ভালবাসার শিকড় স্বদেশের প্রেক্ষাপটে বিস্তার করতে হবে। প্রত্যেক দেশের একটি স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, সেই অভিরুচি নিয়েই সেই দেশের মানুষ গড়ে ওঠে। এমনই ভাবে ভারতবর্ষ তার সন্তানদের প্রকৃতি গঠন

করেছে। বিদেশীর দ্বারে ভিক্ষা করলে সেই স্বভাবে বিকৃতি আসবে। সুতরাং সে পথে না গিয়ে ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে হৃদয়ে ধারণ করে, তার সুপ্রাচীন আদর্শকে সম্মান জানিয়ে নিজেকে পূর্ণ পরিণতরূপে গঠন করতে পারলে তবেই বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করার অধিকার জন্মায় এবং নিজেরটিও তাকে দান করা যায়। আদানপ্রদানে কোনো লজ্জা নেই, অবমাননা নেই, অসম্মান নেই।

এই শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন নিঃসার্থ ''অধ্যয়ন-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।'' এই শিক্ষাগুরু অনেকেই ছিলেন, তাঁদের ধনদৌলতের স্পৃহা ছিল না। সমাজে তাঁরা মানী ব্যক্তি ছিলেন। এখনো এমন শিক্ষক অনেকেই আছেন। কিন্তু শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি ব্যাকরণ, স্মৃতি ন্যায়ের পাঠকে বর্জন করেছে। বিদ্যাদানের মহান গৌরব এখনো পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তবুও রবীন্দ্রনাথ আসাবাদী। তিনি মনে করেন শিক্ষাজগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে এমন কিছু মানুষ আসবেন যাঁরা ইংরাজদের শিক্ষাবিধিকে অনুকরণ করবে না। তাঁরা ''বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া মনে করিবেন।'' প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে তাদের জীবনযাত্রা হবে সরল, চিন্তাধারা হবে নির্মল ও পবিত্র। তাদের শিক্ষা আধুনিক ভাবনাকে অস্বীকার করবে না, সেখানে বিদেশী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর শাসনের পরিবর্তে স্বাধীন দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠবে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, ''ইংরাজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এমনতরো জনকয়েক গুরুকে জন্ম দিতে পারবে.....।''

৪.২ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্যশিক্ষার স্পর্শ বাঙালি সমাজমানসে যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানকে জানার সচেতনাতা নিয়ে এসেছিল নিঃসন্দেহে। সেই সূত্রেই এসেছিল ইতিহাস অন্বেষণের বিরাট কৌতূহল। বাঙালির ইতিহাসচর্চার প্রথম মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, যার পটভূমিকায় ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন। তাছাড়াও ডিরোজিও শিষ্যরা, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ইতিহাসচিন্তা করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত একটি বিষয়ও ছিল ইতিহাস; কিন্তু সে ইতিহাস মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা রচনা করলেও, তা ভারতবাসীর নিজস্ব ইতিহাস হয়নি। দেশপ্রীতি এবং নিজস্বগবেষণার প্রেক্ষাপটে যারা প্রথম ভারত-ইতিহাস সন্ধান করলেন, তাঁদের অন্যতম রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষীরা। সেইসঙ্গে উপন্যাস, কাব্য নাটকেও প্রতিফলিত হল ভারতগৌরবের বহুমুখী কাহিনী। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং আরও অনেকের সাহিত্যকর্ম।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাঁর পরিবারের মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির একটা স্থির দৃপ্ত উজ্জ্বল শিক্ষা ছিল, এবং সেই আলোর অনুপ্রেরণা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা ভারতগৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল খুব অল্পবয়সে। অ(য়কুমার মৈত্রর সম্পাদনায় ১৮৯৯ সালে রাজশাহী থেকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রিমাসিক পত্রিকাকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন ''আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা এবং আন্দোলনের যে জীবনীশক্তি নানা আকারে কার্য করিতেছে, এই ইতিহাসক্ষুধা তাহারই একটা স্বাভাবিক ফল''। ভাদ্র ১৩০৫ সালে ভারতী পত্রিকায় এই রচনাটি প্রকাশের বিবরণ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' (২য়) গ্রন্থে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এটি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্গত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'ঝাঁসীর রানী' ১২৮৪ (১৮৭৭) সালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ কালে লিখেছিলেন। রবিজীবনীতে (১ম খন্ড) জীবনীকার প্রশান্ত পাল অনুমান করেছেন যে সেই কালেই প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভা ও রজনীকান্ত গুপ্তর জানুয়ারী ১৮৭৭ থেকে খন্ডাকারে প্রকাশিত ''সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'' রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছল। ভারতী পত্রিকার এই প্রবন্ধটির

শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাঞ্জীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি।' কিন্তু এক নির্ভীক বলিষ্ঠ মনোভাব এবং তীব্র স্বদেশপ্রীতি প্রবন্ধটির প্রতি ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। সিপাহীযুদ্ধের কালে ঝাঁসীর রাণীর লক্ষ্মীবাই সহ অনেক রাজপুত মারাঠা বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন, কিন্তু আত্মাভিমানী ইংরেজ শাসক তা করেননি। উপরন্তু তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত অমর্যাদাকর মনে হয়েছিল। প্রবন্ধটির উপকরণ সংগ্রহ প্রসঙ্গে বলেছেন "বিদেশীয়দের পক্ষপাতি ইতিহাস"। আশ্চর্যের বিষয় 'দিল্লি দরবার' কবিতাটি রাজরোষের আশংকায় প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এই প্রবন্ধটি বিনা বাধাতেই প্রকাশ করেছিল। মনে করা অসঙ্গত নয় যে নিজের স্বদেশগৌরবকে হৃদয়ে ধারণ করেই রবীন্দ্রনাথ পক্ষপাতদুষ্ট বিদেশী লিখিত ইতিহাসের প্রতি ভরসা করেননি এবং ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাস রচনা করার দায়বদ্ধতায় ঐতিহাসিকদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তা না করলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক তথ্যই অজানা থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার প্রাথমিক ভূমিকা হিসাবে প্রবন্ধটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যতকে পর্যবেক্ষণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। কাল থেকে কালান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। তিনি বারবার বলেছেন যে ভারতবর্ষের অন্তরনিহিত যথার্থ রূপ রাষ্ট্রনৈতিক উত্থানপতনের ইতিহাসে নিহিত নয়। এই প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম যে ভারতবর্ষকে জানতে হলে রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়া বাদ দিয়ে তার সামাজিক পরিমণ্ডলকে উপলব্ধি করতে হবে। সেখানেই ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণতা। পাঠান মুঘলের দ্বন্দ্বের বাইরেও অনেক চিন্তাবিদ মনীষী এসেছিলেন সেই যুগে। মধ্যযুগের বিদেশী অনুপ্রবেশের আঘাতে জাতীয় চরিত্রে যে শিথিলতা এসেছিল, সেইখানেই তাঁরা আঘাত দিয়ে ভারতবর্ষের যথার্থ মর্মস্থানটি উদঘাটন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ভাবনার মধ্য দিয়ে "প্রকৃত ভারতবর্ষের যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।" তাই রবীন্দ্রনাথের সমাধানসূত্র ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধান করা, যার দ্বারা "দেশের মূল মর্মস্থানটি" খুঁজে নিতে হয়।

আধুনিকযুগে জনজীবনকে কেন্দ্র করে ইতিহাস রচনার যে বিপুল প্রচেষ্টা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রবন্ধে সেই সমাজসত্তাকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, যে সমাজ বহু সঙ্কটের মধ্যেও নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করেছে। এই রূপ রচনাতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস যথার্থ রূপে প্রতিভাত হবে—এইটাই রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। ১৯১০ সালে লেখা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ আর্য-অনার্য সংঘর্ষের কথা দিয়ে আরম্ভ করলেও মূলতঃ ভারতীয় সমাজবিবর্তনের চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। সেখানে রয়েছে এক মিশনের ইঙ্গিত। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখছেন, তখন ভারতবর্ষ ইংরাজের পদানত। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার মূলসুত্রটি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানচ্যুত হয়েছিল। সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ সচেতন করতে চেয়েছেন। তিনি অখণ্ড ঐক্য সমন্বিত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করতে হলে সেই ঐক্যকে উপলব্ধি করার শিক্ষা নেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ সকল অসামঞ্জস্যের মধ্যে সমন্বয়সাধনই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। তিনি অনেক গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যথার্থ ইতিহাসবিদকে আহ্বান জানিয়েছেন, যিনি ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যে কোনো সভ্যতার স্বরূপকে অনুধাবন করতে পারেন। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ যে কালে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই সময়ে স্বদেশচেতনার ঔজ্জ্বল্যে ভারতবাসী বিশেষভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং ভারতের রাষ্ট্রগৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ভারত-আত্মার স্বরূপকে না জানলে শুধু বহিরঙ্গের উন্মাদনায় স্বদেশের উপলব্ধি স্থায়ী হয় না। যে ইতিহাসকে দেশের ইতিহাস বলে জানানো হয়, সেখানে স্বদেশ নেই। সেখানে লেখা হয় মুঘল পাঠানের রণসজ্জা, তাদের জীবনের বিলাস-বৈভব। নানা আলোছায়ার

মোহ— ''তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে— সেই পুঁথিখানি কেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র মুখস্থ করিয়া লয়।'' অত্যত বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছেন। ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাসকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্যই তাঁর আন্তরিক আবেদন ইতিহাসবিদের কাছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির এক প্রথাবহির্ভূত রূপ আমরা দেখতে পাই, সেই রূপ নিছক আবেগমথিত নয়, সেখানে রয়েছে সত্যানুসন্ধানের এক বিপুল প্রয়াস। সেই মহৎ অভিপ্রায় তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন ভারত-সন্তানের হৃদয়ে। সেখান থেকেই প্রকৃত স্বদেশচেতনা জন্ম নেবে। সার্থক হবে তাঁর স্বপ্ন, যে স্বপ্ন থেকে তিনি সকলকে আহবান জানালেন—

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। যুগে যুগে ভারতবর্ষে বহিরাগতদের গ্রহণ করেছে তাদের স্বধর্মে স্থিত থাকার অধিকার গ্রহণ করেনি— কবির চিত্তে

''তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।''

এই বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করে অখণ্ড ভারতবর্ষের ঐক্যভাবনাকে ধারণ করে গড়ে উঠবে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসেই ভারতবর্ষের পরিচয়।

৪.৩ সম্ভাব্য প্রশ্ন ঃ

১। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কোন প্রেক্ষাপট থেকে দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত বিচার করো।

২। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও ভারতীয় জীনবদর্শনের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন, তার একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করো।

৩। ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস বলতে কী বোঝায়, সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রকাশ করো।

৪। ভারতের ঐতিহ্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথ কার কাছে আহবান জানাচ্ছেন? এই প্রসঙ্গে তাঁর আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ''দেশের মূল মর্মস্থানটি খুঁজে নিতে হয়''— দেশ বলতে কোন দেশের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন? মূল মর্মস্থান বলতে কী বোঝায়?

২। ''তাহারা আলোক আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয় না''। কোন জাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে অভিমতটি বিচার করো।

৩। ''তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে''। প্রসঙ্গ নির্দেস করে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪। তাঁরা বিদ্যাব্যবসায়কে ঘৃণা করিয়া বিদ্যাদানকে কৌলিকব্রত বলিয়া মনে করিবেন''। কাদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি? তাঁর বক্তব্যের অনুসরণে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। রবীন্দ্রজীবনী (২য়খন্ড)— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
২। রবিজীবনী (১ম খন্ড)— প্রশান্তকুমার পাল।
৩। রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা— ভবতোষ দত্ত।
৪। ইতিহাসের রবীন্দ্রনাথ— মধুছন্দা পালিত।

একক 5 ❑ জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

5.3 রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্ব

5.4 জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয়—তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

5.5 অনুশীলনী

5.6 গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমকালে অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন জীবনচরিত লেখার জন্য। সে সম্পর্কে অনেক আলোচনাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যই ছিল জীবেনর স্মৃতি আর জীবনের ইতিহাস এক নয়। মনের পটে অনেক স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, অনেক থাকে অন্ধকারের বিস্মৃতিলোকে। সেই গ্রহণবর্জনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসবিকাশের বহু সূত্র রেখে গেছেন জীবনস্মৃতির পাতায়। এই রচনা সম্পর্কে তাঁরমনোভাবও অব্যক্ত রাখেননি। মনের মধ্যে উদ্ভাসিত ছবি যদি বাক্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে পাঠকমনে হুবহু ফুটে উঠতে পারে, তবেই তা হবে সাহিত্যপদবাচ্য— এটি ছিল তাঁর একটি বক্তব্য। তিনি বলছেন— 'ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসেবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।''

৫.২ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

জীবনসৃমতি রচনা সম্পর্কিত তথ্যগুলি নানা লেখকের এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও লেখায় বি(প্তভাবে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে ২৫শে বৈশাখ, ১৪০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে (ষোড়শ খন্ড) সমস্ত তথ্য একত্র সঙ্কলিত হয়েছে। সেই বিবরণ যথাযথরূপে উদ্ধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ যে নিছক জীবনী বা জীবনবৃত্তান্ত লেখেননি এই তথ্য সঙ্কলনে নানাভাবেই তার সমর্থন রয়েছে।

গ্রন্থ হিসেবে মুদ্রিত হবার আগে 'জীবনস্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৮ থেকে শ্রাবণ ১৩১৯ পর্যন্ত।

প্রচলিত রীতিতে আত্মজীবনী লেখার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে কুণ্ঠা ছিল, 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ (দ্র রচনাবলী ১০ পৃ ৩৭৪-৭৬) বা 'উৎসর্গ' বাহির হইতে দেখো না এমন করে' কবিতা (দে রচনাবলী ২, পৃ ৮০-৮১) কিংবা 'পশ্চিমযাত্রীর ড়ায়ারি' র এই মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। 'অতিবি(োসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্মরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে। জীবনচরিত থেকে যদি বিস্মরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃতচরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী।' (রচনাবলী ১২, পৃ ২১৯)। 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হয়ে যাবারও অনেক পরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে এইরকম একটি সংলাপ হয়েছিল তাঁর— প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন—

আমি। কবির জীবন-চরিত জিনিষটা কি লেখা সম্ভবপর?

কবি। ঠিক হয় না। বাইরের ঘটনার কথা বলা যায়, কিন্তু আসলে কখন্ কোন্‌টা কেন হলো বলা শক্ত। বলা যায়ও না।

আমি। আচ্ছা, আজ যদি কালিদাসের নিজের autobiography হঠাৎ আবিষ্কার হতো, আপনার কি পড়বার ইচ্ছা হতো না।

কবি। হতো না? অবিশ্যি লুফে নিয়ে পড়তুম।

আমি। আপনার নিজের autobiography একটা লিখে রেখে যাওয়া উচিত। আমরা কেউ দেখবো না— ৫০ বছর পরে বা ১০০ বছর পরে যেটা খোলা হবে। যদি লেখেন তো আপনার সবচেয়ে বড়ো লেখা হবে এইটা। তা ছাড়া আপনার কথা কেউ লিখতে পারবে না। এতো complex— আপনার নিজের কথা শুধু আপনি একা লিখতে পারেন। প্রকাণ্ড বড়ো একটা drama হতে পারে।

— মঙ্গলবার, ৯ আগস্ট ১৯৩২, 'দিনলিপি', 'রবীন্দ্রবীক্ষা ২৮, পৃ ৭৮

'জীবনস্মৃতি' রচনার আগেও অন্তত তিনবার রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত আত্মকথা লেখেন। একটি ১৩১১ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য (দ্র আত্মপরিচয়(রচনাবলী ১১, পৃ ১২৫-৩৬) নিয়োগীকে যে 'জীবন ও রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে' তিনি লিখে দিয়েছিলেন, রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'আত্মপরিচয়' এর পরিশেষে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে তা মুদ্রিত আছে। অন্য চিঠিটি ভুবনমোহন রায়-সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' পত্রিকার ভাদ্র ১৩০২ সংখ্যায় 'রবি বাবুর পত্র' নামে সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে।

রবি বাবুর পত্র

শ্রাবন মাসের 'সখা ও সাথী' তে শ্রীযুক্ত(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাল্য-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দুই একটি ভ্রম দেখাইয়া রবীন্দ্র বাবু আমাদের যে চিঠি লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

''আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিন্ডদানের পরিবর্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতিভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগেভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সৎকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রপাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ এখনো আমা জীবন আমরাই হস্তে আছে; আশাকরি, আরও কিছুকাল থাকিবে, যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ কবি তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাহার ধর্ম্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্য-বিবরণ লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া গিয়াছেলিন, তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই— এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।

কিন্তু তাহা লইয়া অধিক পরিতাপ করিতে বসিলে অবিনয় প্রকাশ করা হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের দুই একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত(রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, সেইখানে বঙ্কিমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় কন্যা-কর্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইতে আসিলে তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না— এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই।

২। ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন; আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।

৩। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন উপাধি দেওয়া হইয়াছে; নিশ্চয়ই সেটা বিস্মৃতিবশতঃই ঘটিয়াছে।

৪। অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া প্রভূত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম সে কথা যথার্থ।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

১৩১৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে মীরা দেবীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা (করে) তাঁদের শোনাই—দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে—কোনো দিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে—আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্—ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। আমার ত এই মুস্কিল অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।

—চিঠিপত্র ৪, পৃ ২১

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের আত্মকথাটি লিখবার সময় (১৩১১) থেকে উদ্ধৃত এই চিঠির কাল (১৩১৭) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনচরিত' লিখবার কিছু কিছু আয়োজন করেছেন বলে অনুমান করা যায়। 'রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রাম এবং' গ্রন্থে প্রতাপকুমার মুখোপাধ্যায় যামিনীকান্ত সেনের একটি লেখার উল্লেখ করেছেন। সেই লেখায় দাবি করা আছে যে যামিনীকান্তই 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি প্রথম পড়েন ১৩১৩ বঙ্গাব্দে :

". . . আপনি যদি আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু লেখেন, তবে আপনার কবিতার রসভোগের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে।" তিনি এ কথা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন এবং আমার সহিত একমত হলেন, মনে হ'ল।

এর কিছুকাল পরে তিনি আমাকে হস্তলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি দিলেন পাঠ করতে। এটিই হচ্ছে তাঁর জীবন-স্মৃতি। এটা হ'ল ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসের ঘটনা।

'জীবনস্মৃতি'র যে একাধিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, এ হয়তো তেমনই এক প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি। কয়েক বছর পর, ১৩১৮-র ২৩ বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সীতা দেবী লিখেছেন:

. . . তিনি বলিলেন, 'তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, সেটা তোমাদের বেশি interesting লাগবে। আমার লেখা 'জীবনস্মৃতি' তোমাদের পড়ে শোনাই।'

সকলে মহোৎসাহে 'জীবনস্মৃতি' শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। সেদিন 'জীবনস্মৃতি'র অনেকখানিই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল।

—'পণ্যস্মৃতি', প ১৬

এর পর ২৫ বৈশাখেও খানিকটা অংশ পড়া হয়েছিল।

অজিতকুমার চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ'-বিষয়ক তাঁর আলোচনাতেও (২৪ বৈশাখ ১৩১৮) পাণ্ডুলিপি থেকে কোনো কোনো অংশ ব্যবহার করেন। এর কয়েকদিন পরই লেখাটি প্রকাশ করবার স্বাভাবিক প্রস্তাব আসে 'প্রবাসী'র পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের দুটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল :

১. বাঃ তুমি তো বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও! এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করতে হবে। সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত হয় তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠ্‌চ।

যতদিন বেঁচে আছি জীবনটা থাক্ তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই . . . ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

—চিঠিপত্র ১৪, পৃ ৩৪

২. আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই"—এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাক্‌ত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাক্‌বে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচি নে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and white-এ আমার জীবনটার একগালে চুন ও একগালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও সাদাচুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুল্‌তে পারে না। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

—তদেব, পৃ ৩৫-৩৬

সম্ভবত এই চিঠির পরই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অনুরোধ তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছয়। রামানন্দকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

১. আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফঃস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

—চিঠিপত্র ১২, পৃ ৬-৭

২. জীবনস্মৃতি কপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতুহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। . . .

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

— তদেব, পৃ ৮-৯

একই তারিখে লিখলেন চারুচন্দ্রকে (চিঠিপত্র ১৪, পৃ ৪১) : 'তোমার হাতের জীবন সমর্পন করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি।' এবং তার কয়েকদিন পর আবার :

১. জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্ব্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধহয় দেখেছ— জিনিসটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি— অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি— আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্তু আপরিতোষাদ্‌ বিদুষাং ইত্যাদি। জুন ১৯১১

— চিঠিপত্র ১৪, পৃ ৪৩

২. কবিকে (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) আমার কবিজীবনটা পড়িতে দিয়ো। সে ত সম্পাদক শ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল— অতএব সে ওটা পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

— তদেব, পৃ ৪৬

৩. জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি— ওটাও সাফসোফ করে দিচ্চি— খুব মনোযোগ করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে— নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২৯ আষাঢ় ১৩১৮

— তদেব, পৃ ৪৮

মুদ্রণকাজ চলার সময়েও কেবলই যে পরিবর্তন চলছিল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কোনো কোনো চিঠিতে তার ইঙ্গিত আছে।

১. জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন। কেননা কিছু কিছু বাড়ানো চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— আর ২০/২২ দিন লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি ''জীবনস্মৃতি''র সমস্ত কপি আমার কাছে রেজেস্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপরে তুলির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। ৮ ফাল্গুন ১৩১৮

— চিঠিপত্র ১২, পৃ ১৯

২. যদি এবারকার জীবনস্মৃতির ফাইল প্রস্তুত না হইয়া থাকে তবে অসংশোধিত প্রুফ পাইলেও চলিবে। অমনি আষাঢ়ের কাপি পাঠাইবেন, হয় তা কিছু যোগ করিতে হইবে। ১৯১২

— তদেব, পৃ ২১

৩. ''জীবনস্মৃতি''র শেষষের কথাগুলা মোটমুটিভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? ১৩ ফাল্গুন ১৩১৮

— চিঠিপত্র ১২, পৃ ২৩

প্রিয়ম্বদা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখচেন রবীন্দ্রনাথ

আমার যেটুকু বলবার আছে, জীবনস্মৃতিতে বলেছি— বই আকারে ছাপবার সময় আরো কিছু কিছু যোগ করে দেওয়া যাবে। ২৫ ফাল্গুন ১৩১৮

— রবীন্দ্রবীক্ষা ২৭, পৃ ১৪

উদ্ধৃত চিঠিগুলির একটিতে চারুচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন 'ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি'। মুদ্রিত ভূমিকাংশটির পরিবর্তে 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম এবং দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই দুই সূচনা দেখা যায়।

প্রথম পাণ্ডুলিপি

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন রিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বলিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়— কেননা, তাঁহাদের জীবনাটাই তংাহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয় — কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে— আবার জীবনের কথা কেন।

এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধসত্ত্বেও নিজের জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়িয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া যায়— দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।

ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও দুটো একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সময় জীবনের অন্তর্গত।

কর্মবীরদের জীবন কর্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম তাঁহাদের জীবনকে গঠিত করে। আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে— বর্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব। আজ এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে ১৮৯৪ সালে লিখিত এই ক'টি হঠাৎ চোখে পড়িল—

'আমি আমার সৌন্দর্য উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার রায়িভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকারই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ়বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতে অন্তর্জগৎ, জীবনের অর্ন্তজীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।'

এইরকমে পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মতো একত্রে রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু তেমন করিয়া লেখা নিতান্ত সহজ নহে। তেমন

সময় এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ নাই, ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ করি।

এখন উপস্থিতমত আমার জীবন ও কাব্যকে জড়াইয়া একটা রেখাটানা ছবির আভাসপাত করিয়া যাইবে। যে-সকল পাঠক ভালোবাসিয়া আমার লেখা পড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এটুকুও নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। আমার লেখা যাঁহারা অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন না তাঁহারাও সম্মুখে বর্তমান আছেন কল্পনা করিলে তাঁহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সংকোচে কলম সরিতে চায় না—অতএব এই আত্মপ্রকাশের সময় তাঁহাদিগকে অন্তত মনে মনেও এই সভাক্ষেত্রের অন্তরালে রাখিলাম বলিয়া তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আরম্ভেই একটা কথা বলা আবশ্যক, চিরকালই তারিখ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কাঁচা। জীবনের বড়ো বড়ো ঘটনারও সন-তারিখ আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না; আমার এই অসামান্য বিস্মরণশক্তি নিকটের ঘটনা এবং দূরের ঘটনা, ছোটো ঘটনা এবং বড়ো ঘটনা সর্বত্রই সমান অপক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আমার এই বর্তমান রচনাটিতে সুরের ঠিকানা যদিবা থাকে তালের ঠিকানা না থাকিতেও পারে।

প্রথমে আমার রাশিচক্র ও জন্মকালটি ঠিকুজি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

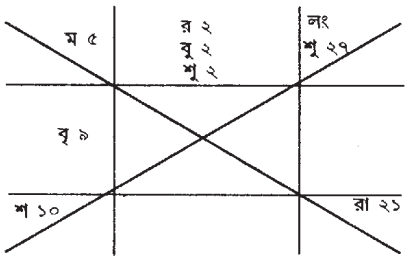

১৭৮৩ । ০ । ২৪ । ৫৩ । ১৭ । ৩০

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী সোমবার

ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫ শে বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে আমার জন্ম হয়। ইহার পর হইতে সন-তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি

এই লেখাটি জীবনী নহে। ইহা কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্র। এই স্মৃতিতে অনেক বড়ো ঘটনা ছোটো এবং ছোটো ঘটনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। যেখানে ফাঁক ছিল না সেখানেও হয়তো ফাঁক পড়িয়াছে, যেখানে ফাঁক ছিল সেখানটাও হয়তো ভরা দেখাইতেছে। পৃথিবীর স্তর যেরূপ পর্যায়ে সৃষ্ট হইয়াছিল আজ সর্বত্র সেরূপ পর্যায়ে সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই, অনেক স্থানে উলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমার স্মৃতিতে জীবনের স্তরপর্যায় আজ হয়তো সকল জায়গায় ঠিক পরে পরে প্রকাশ পাইতেছে না, কোথাও হয়তো আগেকার কথা পরে, পরের কথা আগে আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব ইহাকে জীবনের পুনরাবৃত্ত বলা চলে না—ইহা স্মৃতির ছবি। ইহার মধ্যে অত্যন্ত যথাযথ সংবাদ কেহ প্রত্যাশা করিবেন না—অতীত জীবন মনের মধ্যে যে-রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছে এই লেখায় সেই মূর্তিটি দেখা যাইবে।

নিজেকে নিজের বাহিরে দেখিবার একটা বয়স আছে। সেই বয়সে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে নিজের জীবনক্ষেত্র নিজের কাছে অপরাহ্নের আলোকে ছবির মতো দেখা দেয়। অন্যান্য নানা ছবির মতো সেই আপন

জীবনের ছবিও সাহিত্যের পটে আঁকা চলে। কয়েক বৎসর হইল তেমনি করিয়া অতীত জীবনের কথা কয়েক পাতা লিখিয়াছিলাম।

জীবনের সকল স্মৃতি স্তূপাকার করিয়া ধরিলে তাহার কোনো শ্রী থাকে না। সেইজন্য আমি একটি সূত্র বাহিয়া স্মৃতিগুলিকে সাজাইতেছিলাম। সেই সূত্রটিই আমার জীবনের প্রধান সূত্র, অর্থাৎ তাহা আমার লেখক জীবনের ধারা।

এই ধারাটিকে আমার স্মৃতির দ্বারা অনুসরণ করিয়াছিলাম— সন্ধান-সংগ্রহ বিচারের দ্বারা নহে। এইজন্য, একটা গল্পমাত্রের যেটুকু গুরুত্ব ইহাতে তাহার বেশি গুরুত্ব নাই।

এই কারণেই সম্পাদক মহাশয় যখন এই লেখাটিকে বাহির করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন তখন এই কথা মনে করিয়াই সংকোচ পরিহার করিলাম যে, আমারই জীবন বলিয়া ইহার গৌরব নহে, কোনো মানবজীবনের ছবি বলিয়া সাহিত্যে ইহা স্থান দাবি করিতে পারে— সে দাবি অসংগত হইতে ডিম্‌মিস হইতে বিলম্ব হইবে না।

ইহার মধ্যে একটা আশ্বাসের কথা এই যে, যেটুকু লিখিয়াছি তাহা বেশি নহে, তাহা জীবনের আরম্ভ অংশটুকু মাত্র।

প্রথম পাণ্ডুলিপিটির পূর্ণতর পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রবীক্ষা ১৩ শ্রাবন ১৩৯২।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি জন্ম-তারিখ বিষয়ে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখেছিলেন (২৬ বৈশাখ ১৩৪৫)

> ২৫শে বৈশাখ আমার জন্ম সে-বছরে ইংরেজি পাঁজি মেলাতে গেলে চোখে ঠেকবে ৬ই মে। কিন্তু ইংরেজের অদ্ভুত রীতি-অনুসারে রাত দুপুরের পরে ওদের তারিখ বদল হয়, অতএব সেই গণনায় আমার জন্ম ৭ই। — তর্কের শেষ এখানেই নয়, গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্তে বাংলা পাঁজির দিন ইংরেজি পাঁজির সঙ্গে তাল রেখে চলবে না— ওরা প্রাগ্রসর জাত, পঁচিশে বৈশাখকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে) কয়েক বছর ধরে হল ৭ই, তারপরে দাঁড়িয়েছে ৮ই।
>
> — প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬, পৃ ১৯৬

'জীবনস্মৃতি' প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে, নানা সময়ের স্মৃতিচর্চায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বৃত্তান্ত কখনো কখনো বলেছো। শিলং-এ নিরাবণচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে কথোপকথন-কালে অবশ্য আত্মচরিত লেখার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে আরো একবার মন্তব্য করেছিলেন (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪)। নিবারণচন্দ্র লিখেছেন;

> জিজ্ঞাসা করলাম— ''আপনার জীবনস্মৃতি কি আবার লেখা হচ্ছে? ....কবিবর ..., 'না....ওটা হয় না। আমরা গল্প লিখতে পারি, একটা চরিত্র বানিয়ে তোলা যায়, কিন্তু ..... আপনাকে Objectify ক'রে আত্মচরিত লেখা বড়ই শক্ত। কত স্তরে স্তরে যে আমার 'আমিত্ব' ডুবে আছে, তাকে টেনে তোলা অসম্ভব। জীবন-চরিত লেখকই বা অপরের জীবনের কতটুকু দেখতে পান যে, তিনি যথাযথভাবে 'চরিত'টা আঁকবেন? জীবন-চরিত লেখা (তা স্ব-রচিতই হোক্ বা অপরের রচিতই হোক্) দুইই অসম্ভব। ''আমি বললাম— ''আমার 'স্মৃতি-পথে'টা এইভাবে লিখেছি যে, যাঁর সংস্পর্শে যতটুকু এসেছি তাঁর বিষয় মাত্র সেটুকুই লিখেছি, বেশী কিছু লিখতে চেষ্টা করিনি .... Bertrand Russell এর Behaviouristic Philosophy অনুসরণ ক'রে''..... কবিবর ....'' এই ঠিক করেছেন ... আপনার 'বইটে' পড়ে দেখ্‌ব। বিপিনবাবু (বাবু বিপিনচন্দ্র পাল) তাঁর জীবন-কথা লিখ্‌ছেন। আপনাকে জানাই তা শক্ত কথা। বাহ্য-ব্যবহার দেখে অপর মানুষকে কতটা জানা যায়?''

— রবীন্দ্রনাথ সহিত কথোপকথন, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ ৬৫৮-৫৯

ক্ষিতিমোহন সেনের 'দিনলিপি'তে দেখা যায়, কথোপকথন কালে কিছুটা জীবনকথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

গৃহবিদ্যালয়

আহমেদাবাদ শহরে একটি ঘরোয়া সভায় রবীন্দ্রনাথকে একজন প্রশ্ন করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠাইয়াও আপনার পিতা মেন করিয়া আপনাদের এমন জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন? সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই দিতে পারা যাইবে।

গুরুদেব। মেজদাদা ছাড়া আর কাউকেই পিতৃদেব বাইরে পড়াতে পাঠাননি। আমাদের বাড়িটাকেই তিনি যথার্থ বিদ্যালয় করে তুললেন। যদিও দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য আমাদের পরিবারে কিছু আর রইল না, তবু সাংসারিক ব্যয় যথাসম্ভব সংকুচিত করে পিতৃদেব জ্ঞানী ও গুণীদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখলেন। নিয়ত তাঁদের সমাগমে এই বাড়ির আবহাওয়া চিন্ময় হয়ে উঠেছিল। তাঁদের সৎকারে পিতৃদেব যেরূপ অকুণ্ঠিত ভাবে ব্যয় করেছেন, তেমনভাবে ব্যয় করতে অনেক রাজা মহারাজাও পারেননি। এই আবহাওয়া এবং গুণীজনের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগে আমাদের শিক্ষা।

আমাদের বাড়িভরা লোক তখন গম গম করত। আপন পর অতিথি অভ্যাগত সবারই সেখানে স্থান রয়েছে। সকলকে আমার চিনিও না। অভ্যাগতমাত্রেই দ্বারে এলে আতিথ্য পেতেন। তাঁদের জন্য পান তামাক খাবার যথা সময়েই হাজির হত।

এদিকে সমাজে আমরা ছিলাম কতকটা একঘরের মতো। তাই লোকাচার ও সামাজিক শাসন আমাদের উপর কম ছিল। আমরা অনেকটা স্বাধীনভাবে চলতে পেরেছি।

রাজনারায়ণ বসুর জুড়িদার ছিলেন আমার দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। একাধারে তিনি কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক ও ছেলেমানুষ। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' প্রভৃতি কবিতার অজস্রতা বাড়ি ভাসিয়ে দিত আর তার তরঙ্গে বাড়ি কেঁপে উঠত।

এরই সঙ্গে ঝিদের মহলে চলেছে উপকথা রূপকথার ধারা, ভৃত্যদের মধ্যে চলেছে পাঁচালী, রামাণ, বাউল এবং কীর্তন। মেয়েদের মহলে দেখা যেত কাঁথা ও নানা কলায় শিল্প রচনার কাজ। ছেলেদের মধ্যে চলেছে সাহিত্য সংগীত অভিনয় ছবি আঁকা প্রভৃতি, অভিনয়ের জন্য সংস্কৃত থেকে নাটক অনুবাদ। বাংলা নাটকও লেখা চলছে। এই সব সাধনা ও আনন্দের কেন্দ্রস্থলে বসে আছে পিতৃদেব তাঁর নিশব্দ ধ্যানাসনে।.....

নানা তীর্থে, দেবালয়ে দেখা যায় মন্দিরের চারিদিকে থাকে নানা মূর্তি ও সংসারলীলার ছবি, কিন্তু ভিতরে থাকে দেবতার স্তব্ধবেদী। জোড়াসাঁকোর বাড়ির চারিদিকে যদিও সর্বদাই চলেছি শিল্পকলা, সাহিত্যে সদাসচেষ্ট লীলা কিন্তু তার কেন্দ্রস্থলে ছিল সর্বরূপের অতীত রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য ধ্যানের স্তব্ধ সাধনাসন। আমাদের পৈত্রিক সংসার ছিল দেবমন্দিরের, মতো মহনীয়। সেই দেবমন্দিরেই আমাদের জ্ঞানদীক্ষা। সারা জগতে আমার পিতৃদেব যে আলোক দান করেছেন তার মুলেও ছিল এই গৃহেরই চিন্ময় সাধনা। দুইপুলওয়ালা পাড়া এই নামে কেন হয়েছিল তার ইতিহাস আমরা শুনেছিলাম বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। দ্বারকানাথ ও মহর্ষির নামে এই বাড়ির খ্যাতি পূর্বে লোকমুখে চলিত ছিল না। কলকাতার এই অঞ্চলে অনেক জেলেদের বাস ছিল। তাদের প্রধান মাছের বাজার ছিল এ অঞ্চলে, তাই নাম হয় মেছোবাজার এবং ঠাকুরবাড়ি। পাড়ার নাম হয় জোড়াসাঁকো। এইদিকের কলকাতায় চলাচলের রাস্তা খুবি কম ছিল। চিৎপুর সড়ক যখন নির্মিত হয় তখন উত্তর-দক্ষিণে চলাচলের এইটাই ছিল প্রধান পথ। এরও আগে এই বাড়িতে যাওয়া আসা করতে হত নৌকায় খালপথে। ঠাকুরবাড়ির কাছে খালের উপরে একটি কাঠের পুর ছিল। পরে তার কাছেই আর একটি কাঠের পুল হওয়ায় নাম হয় জোড়াসাঁকো। জোড়াসাঁকো, অর্থাৎ দুই পুলওয়ালা পাড়া। .....

ইংরাজির বন্যায় যখন বাংলা প্লাবিত সে যুগে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারে বাংলাকে দৃঢ় করে ধরে রেখেছিলেন। ইংরাজিতে লেখা বলে জামাতার পত্র পর্যন্তও তিনি ফিরিয়ে দিয়াছিলেন। তিনি কি ইংরাজি কিছু কম জানতেন? তাঁর পুত্ররা তাই স্বদেশী বিদেশী কোনো ভাষাতেই কম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। শুধু মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন বলে বিদ্যালয় ছাড়াও সকলে যথার্থ বিদ্যালাভ করেছিলেন।

রূপকথা হল সত্যই রূপ-কথা, অর্থাৎ কথার রং দিয়া নানা অপরূপ ছবি এঁকে যাওয়া। মনের কাছে ছবির পর ছবি রচিত হয়ে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে চলেছে। অপূর্ব তার সৃষ্টি অপূর্ব তার সরলতা। পাঠ্যপুস্তক ও নোট কণ্ঠস্থ করে বিদ্যার্থীরা আজ মরে শুকিয়ে গিয়েছেন। গল্প বলতে বললে তারা এখন বই দেখে বলেন, এর চেয়ে নীরস আর কী হতে পারে? আসল রূপকথা শিল্পীরাই আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মন তৈয়ারি করে তুলতেন। তাঁরা ছিলেন আসল গুরু। আমাদের বাড়িতে এই সব শিল্পীদের আদর ছিল। ইস্কুল থেকে অল্প পরেই আমি বিদায় নিলাম। এই সব গুরুরাই আমাদের গড়ে তুললেন।

আমার আর এক গুরু ছিল আমাদের বাড়ির ছাত ও আকাশ। ইস্কুল নেই, মধ্যাহ্নে দূর থেকে দূরের ফিরিওয়ালাদের রকম রকম ডাক ও বাসনওয়ালাদের ঠং ঠং আওয়াজ শোনা যায়। আকাশচিত্রে চিল ওড়ে, তীক্ষ্ণস্বরে চিলের কণ্ঠস্বর। ছাতে ছাতে মেয়েরা বড়ি দেন, আর চেয়ে দেখি চারিদিকের গাছপালা।

রবীন্দ্রসাহিত্যসম্ভারের বিশাল ক্ষেত্রে বিচরণ করতে গিয়ে তার সঠিক উপলব্ধির জন্য সাহিত্যসচেতন পাঠক অনেকটাই আশ্রয় করেন তার নিজস্ব অভিমতকে, তাঁর দৃঢ় বক্তব্যকে। সেই অনুসন্ধানে দেখা যায়, কোথাও রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত কোথাও আবার অতি স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। এমনই এক প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে নানা ঘটনার উপলব্ধিতে, বহু খ্যাত অখ্যাত মানুষের সংস্পর্শে নিজস্ব এক ব্যক্তিত্ববোধে জাগ্রত হয়ে উঠছেন একটির পর একটি স্তরের মধ্য দিয়ে। সেই স্মৃতিচারণাকেই তিনি চিহ্নিত করেছেন 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) নামে। এক আশ্চর্য নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে নিজের কৈশোর থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত স্মৃতির চিত্রকে তাঁর পরিণতমননের প্রেক্ষাপটে সাজিয়ে তুলেছেন শিল্পীর নিপুণতা দিয়ে। কবিকে তার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না—এ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা। স্মৃতির অন্বেষণ করতে গিয়ে যে ছবি তাঁর মনে জেগেছে তা জীবনী নয় ঠিকই কিন্তু তার প্রতিটি রেখায় যে ঘটনাগুলি ফুটে উঠছে কবির আপনজনরা যেভাবে তাঁর মানসিকতার গঠনকে সবদিক থেকে সাজিয়ে তুলছেন, তা কখনই জীবন বহির্ভূত কল্পনা নয়। তাই 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রজীবনের নানা উদ্ভাসনে উজ্জ্বল, তাঁর জীবনধারার ক্রমাগ্রসরমানতার এক স্পষ্ট চিত্র। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গঠিত এক কবিমনন একটি অপরিণত বালকের কৌতূহলী চোখে দেখা বহিঃ প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি, অতি পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই বালকহৃদয়টির উন্মোচন স্তরে স্তরে অনুভব করা যায়। শিশুমনোরাজ্যে তাঁর অবাধ গতিবিধি জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, যিনি তাঁর সময়ের কোনো লেখককেই তাঁর কঠোর সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করেননি তিনিও 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি উপেক্ষা করতে পারেননি। "কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' উপন্যাসের মত মনোরম। রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের এক একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া নিপুণ তুলিকায় তাহার ছবি আঁকিতেছেন। আপনার অতীতকে বর্তমানকালের চিন্তা ও অনুভূতির রাগে রঞ্জিত করিয়া ফলাইয়া তুলিতেছেন। সুদূর অতীতে তখনকার রবীন্দ্রনাথ যে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, সেই অবস্থাচক্রে পড়িলে এখনকার রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে ও ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইতেন, কল্পনাকুশল কবি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সুখপাঠ্য সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাতে কবিত্ব আছে, সৌন্দর্যসৃষ্টি আছে, কল্পনার লীলা আছে। স্থানে স্থানে কৌতুক ও শ্লেষের আলোকপাতে রচনাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

১. 'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩১৯, নন্দরাণী চৌধুরী সঙ্কলিত, 'সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, ১৩৭৭ পৃ: ৬২

নিজের শিশুকালের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে জোড়াসাঁকোর বাড়ী ও তাঁদের বিশাল পরিবার, উনিশ শতকের খ্যাতনামা বহু মানুষ ও সমাজের চিত্র, তাঁর পরিবারের শিক্ষাবিধি, সঙ্গীতচর্চা তাঁর প্রকৃতি প্রেমের আকুলতা, বাদ যায়নি বাড়ীর পরিচারক পরিচারিকারা—সব কিছুর সমন্বয়ে এক সুসংলগ্ন স্মৃতিচিত্রের সন্ধান পাঠক পেয়েছেন। সেই বৈচিত্র্যবর্ণনায় রয়েছে অসাধারণ পরিমিতিবোধ, আবেগের সংযম আর কৌতুকের আড়ালে আত্মগোপন। উনিশ শতকের মানুষের মধ্যযুগীয় প্রত্যয়বোধে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং সেই উপলব্ধিতে যে অনেক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল, তাকেই নবজাগরণ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের পরিবার স্বতন্ত্র মর্যাদাসহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, 'জীবনস্মৃতি' তার একটি মূল্যবান প্রমাণ। আধুনিক যুগে মানুষের জীবনাচরণে, পরিবেশ শব্দটি বিশেষ অর্থবহরূপে দেখা হয়। এখনকার প্রচুর গবেষণাধর্মী কাজের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও নিজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিকায় পরিবেশের বহুবিচিত্র রূপ ও তার প্রভাবকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সূচনা পর্বটি আরম্ভ হয়েছে তাঁর শিশুকাল থেকে। প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, তার নিবিড় সাহচর্য চিরদিনই রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' আলোচনায় সে প্রসঙ্গ বহুবারই এসেছে। কিন্তু একটি শিশুমনের বিকাশে, তাঁর স্মৃতির উল্লেখে যে কথাটি তিনি অব্যক্ত রেখেও অদৃশ্য রেখায় এঁকেছেন, তা এক কথায় মানবজীবনে পরিবেশপ্রভাব। তা সীমাবদ্ধ নয় শুধু বহিঃ প্রকৃতিতে মানবপ্রকৃতিও সেখানে অঙ্গাঙ্গীবদ্ধ। 'জীবনস্মৃতি' লেখার কালে সেই পরিবেশবিস্তৃতির প্রভাব তাঁর সচেতন মন অনুধাবন করেছিল খুব সহজে। বাল্যজীবন লিখতে বসে বলছেন—"জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোনো এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে রঙ তাহার নিজের স্বভাবের.....।" সেই রঙ থেকেই বিচ্ছুরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের নানা সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী যেমন যুগচিন্তাকে ধারণ করেছিল, সেইভাবেই সেখানে আরও নতুন সংযোজনের মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল, যা সেই বাড়ীর সন্তানদের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। সেই বাড়ীতে বসেই শিশু রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল কোলাহলমুখর জনজীবনের অন্তরালে ঘাট বাঁধানো পুকুর, বটগাছ ও তার দক্ষিণে নারকেল গাছের শ্রেণী; কিন্তু সেই শিশু তখনও গন্ডীর বাইরে যাবার অধিকার পায়নি। পেনেটির বাগানবাড়ী প্রথম সেই সুযোগ এনে দিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে কবি দেখেছিলেন গঙ্গার গতিভঙ্গি, কিন্তু "পায়ের শিকল" না কাটায় গ্রামটি ঘুরে দেখা হয়নি। তাঁর জীবনে এক অভাবিত মুহূর্ত এল পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের প্রস্তাবে। সেই যাত্রাপথের প্রথম অভিজ্ঞতা বোলপুরে প্রকৃতির অনাবৃত রূপ দেখা। পিতার সাহচর্যে কিশোর কবি তাঁর বিস্ময়ভরা অনভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখতেন হিমালয়ের অন্তহীন সৌন্দর্যকে। সেইসঙ্গে শিক্ষালাভও হত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে শিশু বরীন্দ্রনাথ স্কুলের চার দেওয়ালের বন্ধ আবহাওয়ায় কোনোদিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তা সত্ত্বেও মহর্ষির সজাগ দৃষ্টি বোধকরি বালকের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেই তার মনের দ্বার খুলে দিয়েছিল; তিনি তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্যে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন, সত্যবোধের অঙ্কুরকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছিলেন। এই ভাবেই অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধবোধের অনুভূতি হয়ে উঠেছে তাঁর চলার পথের মূল আশ্রয়। এক সমগ্রতার চেতনা তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'র নানা ঘটনা সেই বিচিত্রমুখী অনুভবের পরিচয়বাহী।

'জীবনস্মৃতি'র শেষ অংশ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনের পঁচিশ বছরের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা। তাঁদের তিনটি বালকের শিক্ষারম্ভ দিয়ে স্মৃতির পাতা খুলেছেন। তার বিবরণ যথাস্থানে। কিন্তু স্কুলের গন্ডীবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুহৃদয় যে কতটা জর্জরিত হয়, এ বেদনা তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর স্বপ্ন ছিল মুক্ত বিহঙ্গের মত প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যের আশ্রয়ে সেই মন বিকাশলাভ করুক। শিশু কবির চিত্ত-উন্মেষের যে ইতিহাস আমরা

পেয়েছি, সেখানে বাধ্যবাধকতার অর্গলমুক্ত হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। গতানুগতিক বাঁধা-পথের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন প্রকৃতির অনন্তবৈচিত্র্যকে, সেইখান থেকেই সৌন্দর্যচেতনার আদি-অন্তহীন রূপানুভূতি প্রোথিত হয়েছিল তাঁর সত্তায়। স্কুলের দরজার বাইরে নিয়ে এসে তাঁকে নানাদিক থেকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজন হয়েছে বাড়ীতে থেকেই, তিনি সাড়াও দিয়েছেন সেই ব্যবস্থায়। পরবর্তীকালে তাঁর শি(াবিষয়ক ধ্যানধারণায় একটি সহজাত অনুভূতিপ্রবণ মন কাজ করেছিল নিঃসন্দেহে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা— কি না ছিল তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায়। সব কিছুর মধ্য দিয়ে একটি সত্তা ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করছিল, তবুও সব সচলতার মধ্যেও এক নিভৃতলোকে তাঁর মনের অবস্থান ছিল চিরদিন। তার পরিচয় রয়েছে কবির সারাজীবনের বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যরচনায়। কলকাতার জনারণ্যের মধ্যে অবস্থিত জোড়াসাঁকোর বিশাল বাড়ীতে, এক কোণে নিরালায় খোলা জগতের ক্ষীণ আভাস শিশু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। তারপর পেনেটির বাগানবাড়ীতে গঙ্গার সোভা, সর্বোপরি পিতার সঙ্গে বোলপুর হয়ে হিমালয়যাত্রা, সৌন্দর্য-উপলব্ধির এক সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে কবিকে আকণ্ঠ নিমগ্ন করে রাখল।'' হিমালয় থেকে ফিরিয়া আসিবার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলই বাড়িয়া চলিল।'' এইবার আরম্ভ হল সচেতন সাহিত্যসৃষ্টি, যাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের জীবন নানা অভিজ্ঞতার সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের সামনে। সেই রাজপথে ভীড় করেছেন অগণিত মানুষ, কিন্তু শৈশব থেকে আরম্ভ করে তাঁর পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যাঁদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, তাঁদের কেউ হয়েছিলেন দীর্ঘজীবনের সঙ্গী, আবার কেউ অল্পকালের মধ্যে তাঁর স্পর্শকাতর চিত্তে চিরস্থায়ী চিহ্(রেখে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের কথাই স্বতন্ত্রভাবে স্থান পেয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়।

শিশুস্বভাবে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য থাকে না, সেটি গড়ে ওঠে তার পরিপার্শ্ব থেকে, কারণ সেইখানেই তার নিত্যবিচরণ। মহর্ষি ভবনের পরিমার্জিত জীবনাচরণ, তাঁর পরিবারের কর্মচাঞ্চল্য, সব কিছুর সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবুক কবিমনটি বেরিয়ে এসেছে, 'জীবনস্মৃতি' সে সংবাদও রক্ষা করেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে মানুষের মনের নিভৃতে যে আর একটি সত্তা থাকে, সেই ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গনকে অতিক্রম করে জীবনকে এক গভীর সত্যবোধের দিকে নিয়ে যায়। এই নিভৃতিটুকু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকালেই খুঁজে নিয়েছিলেন, যখন তিনি বাড়ীতে খড়ি আঁকা গন্ডীতে বাঁধা, তবুই খড়খড়ি খুলে সেই শিশু দুচোখ ভরে দেখেছে প্রকৃতির চোট একটি রূপ। কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিলগ্নে পৌঁছানোর অনেক আগেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন জীবনের আনন্দ।

যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারকে সব দিক থেকে সুস্থ চিন্তায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেখানে ধর্মালোচনা, বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যপাঠ, সংগীতচর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অগোচরেই আরেকটি ধারা বয়ে চলেছিল; রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ।'' রবীন্দ্রনাথ আজীবন মানবকল্যাণ সাদনার সংকল্পে স্থির ছিলেন। লোভ, হিংসার পকট আক্রমণ যে মানবসভ্যতাকে বিপর্যস্ত করছে, জীবনের শেষমূহূর্তেও তার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে ভোলেননি। এই মানসিকতার উৎসটি কি খুঁজে পাই না আমরা 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়?

তাঁর মননচর্চার ক্ষেত্রে বিদেশযাত্রার গুরুত্বও কম নয়। প্রথাগত শিক্ষালাভের আশা নিয়ে গেলেও, তা পূর্ণ হয়নি, হলে রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড সত্তা তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আমাদের অভিভূত করত না। তিনি প্রথমাবধিই অত্যন্ত সজাগ মন নিয়ে ইংরেজ-পরিবার, ইংরেজ সমাজকে দেখেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যরীতির যে সুসংগত মিলন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিবারেই দেখেছিলেন, সেইদিক থেকে য়ুরোপীয় জীবনধারা বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি তাঁর মনে। কিন্তু কবির মন তো দেখতে চেয়েছে এক সমগ্র অখন্ড উপলব্ধিকে। 'জীবনস্মৃতি' যখন তিনি লিখছেন, তখন তাঁর সৃজনীপ্রতিভা নিত্যনূতন উদ্ভাসনে অভিনব, সেখানে দুঃখবেদনার নিরন্তর প্রবাহের মধ্যে বাহিত হয়ে চলেছে আনন্দযজ্ঞের আহবান। কবির অন্তর প্রকৃতির উদঘাটন ও ক্রমবিকাশ সেইসঙ্গে তাঁর চোখে বিশ্ব ও মানবজীবনলীলার বিচিত্র সমারোহ—সব

মিলিয়ে অদৃশ্য চিত্রকরের নিপুণ তুলিতে আঁকা ছবি। জীবনস্মৃতির চিত্রগুলি দুর্লভ সম্পদ বাংলাসাহিত্যের দরবারে।

'জীবনস্মৃতি'র অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ইতিহাসের অনেক তথ্য, তার আলোচনাও অনেক হয়েছে, তবুও পুনরুক্ত হয় এই কথাটি যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে উনিশ শতকের এমন এক ঐতিহাসিক কালে যখন বিভিন্ন বিতর্কের কোলাহলে সমাজমানস বিপুলভাবে আন্দোলিত হয়েছে। সেই আগুনের তাপ 'জীবনস্মৃতি'তে নেই। আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্হিজগতের নানা আবর্তন বিবর্তনকে আত্মস্থ করে তিনি নিজের মধ্যে একটি নির্জন নিরাসক্ত জীবনবোধ গড়ে তুলেছিলেন। সুরেশ সমাজপতি 'জীবনস্মৃতি'তে কবিত্ব, 'সৌন্দর্যসৃষ্টি', 'কল্পনার লীলা' দেখেছেন। কিন্তু সেই সুখপাঠ্য রচনাটি পরিবেশনের মাধ্যম কি? অবশ্যই বাংলা গদ্যভাষা, যা 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠেছে তার শাখাপ্রশাখা নিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আগেও এক বিরাট কর্মকান্ডের প্রস্তুতি চলেছিল বাংলা গদ্যভাষা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সুললিত গদ্যরচনাভঙ্গী যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যভাষার প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষার পথ ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ইতিহাস একটু জানা দরকার 'জীবনস্মৃতি' আলোচনার পরিপ্রেক্ষিকায়।

সাহিত্য পাঠকমাত্রেই জানেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যসৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে অনুবাদ গ্রন্থরচনা ও তথ্যপরিবেশন ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন বাদানুবাদের প্রেক্ষাপটে বাংলা গদ্য তথ্যবিবরণে এক ঋজু ভঙ্গী গ্রহণ করল বিচারে ও বিশ্লেষণে। কিন্তু মনের আবেগ প্রকাশের জন্য বা নিছক মননধর্মী রচনার জন্য গদ্যভাষা গ্রাহ্য হয়নি। তখনকার গদ্যে রসসাহিত্যের অলঙ্কার প্রয়োগ উপযুক্ত ছিল না। বিদ্যাসাগর গদ্যভাষার এই রীতিকে আত্মস্থ করলেও বাংলাভাষার নিজস্ব অভিপ্রায়কে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন, সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করলেন, বাংলাভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করে বাংলাশব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করলেন। মনের ভাবকল্পনাকে ব্যক্ত করার মত উপযুক্ত গদ্যভাষার সম্ভাবনা দেখা ছিল। সুতরাং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ধরলে, বাংলা গদ্যভাষা একদিকে আধাফার্সী, আরেকদিকে ইংরিজী, সেইসঙ্গে সংস্কৃতভাষার ধ্বনিমাধুর্য ও শব্দভান্ডার নিয়ে একটি বিশেষ রূপ নিল। এই গঠনপ্রক্রিয়ার পিছনে ছিল অনেক চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষের চিন্তাভাবনা। বিদ্যাসাগর অবলম্বন করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু ইংরাজীভাষার অনুসরণে ছেদচিহ্ন আনলেন, সমাসবাহুল্য বর্জন করলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের দীর্ঘ বাক্যকে ছোট ছোট করে ভাঙলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতের বাহুল্যতা সংহত করে অধিগত করলেন ইংরাজী গদ্যভাষা। সুতরাং বাংলা গদ্যভাষা তার সহজাত নমনীয়তা নিয়ে গ্রহণ করল আধা ফারসী সংস্কৃত ইংরাজী। রবীন্দ্রনাথ সেইসঙ্গে দেখালেন যে বাংলাভাষায় লৌকিক রীতিটিও উপেক্ষার নয়। সুতরাং বাংলা গদ্যভাষা খুব সঙ্গতভাবেই জটিলতার বেড়াজাল ভেঙে কথ্যভঙ্গীর সহজপথে এগিয়ে গেল। কথ্যভঙ্গীর বিচার সাধারণত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দিয়েই করা হয় সাহিত্যক্ষেত্রে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় প্রযোজ্য ক্রিয়াপদই প্রয়োগ করেছেন। এখানে তৎসম শব্দঝঙ্কার রয়েছে, যেমন "তরুশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুইধারে দুই ছবির ঝরণার মত বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে" অথবা বোলপুরে মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লালকাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোট ছোট শৈলমালা গুহাগহ্বর নদী উপনদী রচনা করিয়া বাল্যখিল্যদের দেশের ভূ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। (হিমালয় যাত্রা) এখানে প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত দক্ষতায় সাধুক্রিয়াপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছেন অনেকগুলি নিত্য ব্যবহার্য শব্দের। 'জীবনস্মৃতি'র যে বিবৃতি, সেখানে সমাসবদ্ধ শব্দ, তৎসম শব্দ, সাধুরীতির ক্রিয়াপদ, যা কিছুই থাক, পাঠক কোথাও বাধা পায় না বর্ণনার রসগ্রহণে। এখানে রবীন্দ্রনাথের মনের আড়ালে যে একটি সহাস্য কৌতুক লুকিয়ে আছে, সেখানে তথাকথিত চলিতভাষা ব্যবহৃত না হয়েও 'জীবনস্মৃতি'র গদ্যরীতির প্রাণশক্তি বাংলা বাক্যবন্ধনে উন্নত পথের অভিমুখী

করেছে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের কাব্যরীতি অর্থাৎ মহাকাব্যের ধারা থেকে সরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবকল্পনার জগৎটি তাঁর মনকে অধিকার করেছিল কবিজীবনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে। কাব্যের ছন্দে ব্যক্তি-অনুভূতির প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। 'জীবনস্মৃতি' সামগ্রিকভাবে সেই ব্যক্তি অনুভূতিকেই ফুটিয়ে তুলেছে, যার অন্তর্ধর্মে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কাব্যরচনার গবীর উপলব্ধি, কিন্তু তার বহিরঙ্গে রয়েছে গদ্যের প্রবাহ। সেই প্রবাহে দেখা গেছে তাঁর স্মৃতির মালায় গাঁথা মনের ছোট ছোট ছবি। রচনাভঙ্গীর কৌশলে সাধুভাষাতেও তার ঘরোয়া রীতিটি যথাযথভাবেই রক্ষা পেয়েছে। স্মৃতিচিত্রটি পাঠকের নিজের অনুভূতির রঙে একাত্ম হয়ে গেছে তার স্রষ্টার সঙ্গে। 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধারায় একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। সুতরাং গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ— কোনো গদ্যভাষার মানদন্ডেই এর পরিমাপ করা যায় না। কারণ এ হচ্ছে এমনই এককবিরভাষা যিনি অতি স্বাচ্ছন্দে, সাবলীলভঙ্গিতে তাঁর মানসবিকাশের ইতিহাসে জানিয়েছেন। বিপুল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনচেতনার সৌধ গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিমূলের চিত্র 'জীবনস্মৃতি'। পঞ্চাশ বছর বয়সে রচনা করতে গিয়ে কবির সচেতনতাই তাঁকে চালিত করেছিল পাঠকের মর্মমূলে তাঁর সাহিত্য প্রেরণার প্রবেশদ্বারটি খুলে দিতে।

৫.৩ রবীন্দ্রজীবনের বিভিন্ন পর্ব ঃ

"শিক্ষারম্ভ"

যেহেতু রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'কে জীবনবৃত্তান্ত বলেননি, তাই সেখানে সাল তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিক্ষারম্ভের বয়সের বিস্মরণের কথা বলেছেন। মনে রেখেছেন 'কর' 'খল' বানানের সঙ্গে আদি কবির প্রথম কবিতা 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। সেই মিলের ঝঙ্কারে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মনে রেখেছেন তাঁদের পুরানো খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জের কথা, যিনি হাস্যকৌতুকে তাঁদের পরিবারের সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। তার থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য যে তাঁর দ্রুতগতিতে বলা একটা মস্ত ছড়া কল্পনাপ্রবণ শিশু কবির মনে একটি সুন্দরী সালংকারা বধূর ছবি চিরকালের স্মৃতিতে এঁকে দিয়েছিলেন, মিলনোৎসবের রঙীন ছবি জীবন্ত হয়ে উঠত সেই ''দ্রুত উচ্চারিত শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা''য়। বিরহী যক্ষের যে মধুর প্রণয়ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিতে নানা বর্ণে ফুটে উঠেছে তাঁর শিশুমনে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' শব্দের ব্যঞ্জনাই তার উৎস। এই দুটি কাব্যানুভূতির কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থের সূচনা পর্বে।

এর পরের বিবরণ, স্কুলের অধ্যায়। সেখানে তাঁর অপর দুটি সঙ্গী অধিকার পেলেও, তৃতীয় শিশুটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেন না এবং প্রবল প্রতিবাদ জানালেন পক্ষপাতিত্বের এই অবিচারে। তাঁদের গন্ডীবাঁধা জীবনে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের স্কুলে যাওয়ার পথে ভ্রমণবৃত্তান্তটি তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের কান্নার বীজটি বোধকরি এভাবেই প্রোথিত হয়েছিল। স্কুলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বাড়ীর বাইরে বেরোনোর এই প্রলোভনের খেসারৎ কবিকে যথেষ্টই দিতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ের বাধ্যবাধকতা যে আরও পীড়াদায়ক হবে তাঁর পক্ষে, এক শিক্ষক তাঁকে চপেটাঘাতসহ জানিয়েছিলেন। ''এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বানী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।'' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সূচনা ভৃত্যমহলে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের মাধ্যমে, এটিও একটি অভাবনীয় সংবাদ। এক একটি অনুভূতির বর্ণনায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুজীবনকে যেন পরম মমতায় তুলে ধরেছেন। পুলিশম্যানের কঠোর শাসন তাঁর কাছে নিদারুন ভীতিপ্রদ ছিল। পরিত্রাণের জন্য ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে নিরুদ্বিগ্ন দেখে অবশেষে তিনি আশ্রয় নিলেন রামায়ণপাঠে, একটি অংশের করুণ বর্ণনায় তাঁর চোখে জল দেখে দিদিমা বইটি কেড়ে নিলেন। একটি শিশুমনের প্রতি অমনোযোগে বোধকরি চিরদিনই বেদনার স্মৃতি বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই অধ্যায়েই তার প্রথম সূচনা।

নর্মাল স্কুল

রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজের স্কুলের নাম বলেছেন 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'। বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে একটি শিশুর স্পর্শকাতর মনের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এই অংশে। সেই শিশু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সকৌতুকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে এই বিদ্যালয়ের অনুসরণে তখনই তিনি কিছু নির্বাক জড়প্রকৃতির বস্তুর শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই অনুকরণপ্রিয় হয়, তিনিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সেই কারণেই "শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।" সহজেই অনুমান করা যায়, কী ধরণের উৎপীড়ন সেই কচি অবোধ বালকগুলিকে সহ্য করতে হত। তারপর এল নর্মাল স্কুলের পালা, সেখানকার অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। বিদেশি ইরাজী ভাষায় প্রত্যহ গাওয়া একটি গান ছাত্রদের আকৃষ্ট করত না, এই ভাষা না বোঝা যেন তাদেরই অপরাধ। রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশিত শিক্ষারীতিতে বিশেষভাবেই প্রভাব ফেলেছিল। শিক্ষকে আনন্দময় করার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচয়। নর্মাল স্কুলের সাহপাঠিদের সহচর্যেও তাঁর তৃপ্তি ছিল না। এখানকার শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হতে পারেননি। শুধুমাত্র বাংলা পরীক্ষার বাৎসরিক ফলে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রী প্রশান্ত পাল তথ্যসহকারে দেখিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'তে, 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' নয়। তাঁর বয়স তখন খুব কম থাকায় স্মৃতিচিত্রের তথ্যটি সঠিক হয়নি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি "নর্মাল স্কুল" নামে চিহ্নিত হলেও আসল নাম 'ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট পাঠশালা' বা 'ক্যালকাটা মডেল স্কুল।'[১]

তবে স্কুলের নাম যাই হোক না কেন, পরিণতবয়সে যখন রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' লিখছেন, তখনও শিক্ষাপ্রণালীর ভয়াবহ চেহারা তিনি এতটুকু বিস্মৃত হননি এবং পরবর্তীকালে এই ধরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি।

ভৃত্যরাজকতন্ত্র এবং ঘর ও বাহির

'জীবনস্মৃতি'র এই দুটি অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের ওপর একটি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। তাঁদের অভিজাত পরিবারে দাসদাসীর অভাব ছিল না। পরিবারের নিয়ম অনুসারে বালকরা ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে থাকত। বিদ্যালয়ের স্মৃতি যেমন আনন্দময় ছিল না, তেমনই নির্মম ছিল এই ভৃত্যদের তথাকথিত তত্ত্বাবধানে থাকা। সরসভাবে বর্ণনা করেছেন শুচিবায়ুগ্রস্ত ঈশ্বরের কথা। তার অতিপরিচ্ছন্নতার সঙ্গে গুরুগিরির অভ্যাসটিও ছিল, সে ক্ষেত্রবিশেষে সাধুভাষায় কথাও বলত, যা তাঁর পরিবারে একটি কৌতুকের বিষয় ছিল। এই ঈশ্বর, বালকদের স্থির রাখার জন্য রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শোনাত, এক অপরূপ জীবনভাবনার জগতে মগ্ন থাকতেন। এই মগ্নতা থেকে যখন ব্যাকুল আগ্রহ জেগে উঠছে পরিণামকে জানার জন্য, তখন নিদ্রার সময় এসে গেছে। সেই বিশেষ ক্ষণে মহর্ষির এক অনুচর কিশোরী চাটুজ্জে "দাশু রায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুতগতিতে বাকী অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল.... অনুপ্রাসের ঝক্‌মারি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

জীবনের অনেক ঘটনাই একটি আরেকটির সঙ্গে জুড়ে মনের পটে তার স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখে। তাই সেই শিশু রবীন্দ্রনাথের দেখা কিশোরী চাটুজ্জে 'জীবনস্মৃতি'র বাইরে আবার দেখা দিয়েছেন 'ছড়ার ছবির' বালক কবিতায়।

---

১. দ্রঃ রবিজীবনী (১ম) শ্রী প্রশান্ত পাল, পৃঃ ৬৩-৬৪ ও ৭৬

''কিশোরী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—
থাকত আমার খাত লেখা, পড়ে থাকত পড়া,
মনে মনে ইচ্ছা হত, যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হ'ত এই পাঁচালীর দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গায়ে।''

বিধিনিষেধের বেড়া পার হয়ে খোলনা মনে প্রকৃতির রাজ্যে 'ডাক হরকরা' হয়ে নতুন নতুন গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিল তাঁর 'ডাকঘর' নাটকের গৃহবন্দী অমল।

আবার ফিরে আসে ঈশ্বরের কথায়। ঈশ্বরের অনেকগুণের মধ্যে একটি ছিল আফিং সেবন, যার ফলে প্রায়ই বালকদের দুধের বরাদ্দে সে ভাগ বসাথ. এমন কি তাদের প্রাপ্য জলখাবারটুকু পুরোমাত্রায় দিতেও তার সম্মতি থাকত না। সেই ঈশ্বরকে প্রসন্ন রাখা একটি কাজ ছিল। সুতরাং বাড়ীতেও খুব আনন্দ ছিল না ভৃত্যদের কঠোর শাসনে।

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে জোড়াসাঁকোর বিশাল পরিবারে এই বয়সের শিশুদের প্রতি অভিভাবকরা নজর দিতেন না। পরিবারের রীতি অনুযায়ী জন্মের পরেই তার স্থান পেত দাসীর কোলে, যে বয়সে মাতৃস্নেহই মূল আশ্রয় হওয়া উচিত ছিল। আরেকটু বড় হলেই অন্দরমহল থেকে একেবারে বাইরে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' স্থানান্তরিত। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চাঞ্চল্যকেই তারা দমন করত প্রহার করে। এইটিই রবীন্দ্রনাথের চার পাঁচ বছর বয়সের স্মৃতি।

ধনীগৃহের সন্তান হলেও সেই পরিবারে শিশুদের কোনো ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না। পিছনে ফিরে সেই সরল জীবনযাপনের এক বিরাট প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর পরিণত বয়সে লেখা জীবনস্মৃতির 'ঘর ও বাহির' অংশে। অনাদরের মধ্য দিয়ে বড় হলেও মনের স্বাধীনতা ছিল, নিয়ম নীতি প্রভৃতি সুসজ্জার বেড়াজালে তা বন্দী হয়নি। সেই কালের প্রেক্ষিতে তিনি বলছেন, ''আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল....। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাতিাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁটি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না।'' যে কোনো মহৎ প্রাপ্তির জন্য সাধনা করতে হয়, অর্জন করার গৌরবটুকু সংগ্রহ করতে হয়, হয়ত রবীন্দ্রনাথ সেইদিকেই ইঙ্গিত করেছেন অনাগতকালের দিকে তাকিয়ে।

এরপর এসেছে গম্ভীর কথা, এটিও রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, নানাভাবে, নানাভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। শ্যাম নামে ভৃত্য শিশু রবীন্দ্রনাথেক একটি খড়ি দিয়ে গন্ডী কেটে আবদ্ধ করত এবং গন্ডী ভাঙলে যে সমূহ বিপদ, সেই পাঠটুকু রামায়ণ কাহিনী থেকে নেওয়াই ছিল। কিন্তু সেই খড়ির দাগ না মুছেও শিশুকবি তাঁর আনন্দের উপলক্ষটি খুঁজে বার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মনের নিভৃতে মুক্তিপিয়াসী বালকটি দেখত ঘাটবাঁধানো পুকুর, পাঁচিলের গায়ে চীনা বট আর দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। সারাদিন সে পুকুরটি দেখত, সেখানে কত ধরনের মানুষের আনাগোনা, কত বিচিত্রভঙ্গী তাদের স্নানের রীতিতে। ক্রমশঃ পুকুরঘাট নির্জন হয়ে এলে তাঁর মনকে ঘিরে ধরত সেই প্রাচীন বট। রবীন্দ্রনাথের সেই অনুভূতির গভীর চেহারা, চিরদিনই তাঁর হৃদয়কে জাগ্রত থেকেছে। বিশ্বের অনন্ত রহস্য তাঁকে হাতছানি দিয়েছে বারে বারে। অনেকদিন পরে ঝুরি নামা বটগাছকে প্রশ্ন করেছিলেন- 'ছোট ছেলেটিকে মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট'। বর্ণনা ছাড়িয়ে মাঝে মাঝেই স্মৃতিচারণে আসে

বিষণ্ণ বিশ্লেষণ, "কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! ..... আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিনদুর্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।"

'ঘর ও বাহির' অংশে যেন বয়ঃপ্রাপ্ত মননশীল রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিগুলি উঠে আসছে বাল্যস্মৃতির ছায়ায়। কিন্তু সেকালে যা ছিল আলোছায়ার খেলা, পঞ্চাশ বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তারা রসজ্ঞ বিশ্লেষনে মন্ডিত। বিশ্বপ্রকৃতির দ্বার তাঁর কাছে তখনও রুদ্ধ, মিলনের বাধায় ভালবাসার আকর্ষণ তীব্র হয়েছে। একদিন গন্ডী মুছে গেছে, কিন্তু মনের বাধা সরে যায়নি। তাঁর সেই আক্ষেপই অনুরণিত খাঁচার পাখীর বিলাপে আর তারই পাশে বনের পাখীর কূজনে মুক্তির উল্লাস। মন জানে না—'আমি কেমনে বনে বাহিরিব'।

শিশুকাল অতিক্রম করে ভৃত্যশাসনের রাজ্যে যখন রবীন্দ্রনাথ একটু বড় হয়েছেন, তখনই একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে—বাড়ীতে নতুন বধূ সমাগম, সেই নাম না-জানা বধূটির নিবিড় স্নেহসান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু প্রসঙ্গটির তিনি উল্লেখ মাত্র করে নীরব হয়েছেন। ছাদে গিয়ে দেখতেন গৃহকর্ম অন্তে মধ্যাহ্নের এক নির্জন অবকাশ। চোখে পড়ত নানা আয়তনের বাড়ী, তার ছাদ, তার চিলেকোঠা। বন্ধনঅসহিষ্ণু শিশুমন কল্পনায় বাড়ীগুলির মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করত। আবার যে কোনো প্রসারিত ধ্বনি তাঁর মনকে 'উদাস' করে দিত। অনেক বর্ণময় চিত্রের মধ্যে অন্যতম আরেকটি হচ্ছে পিতার ভ্রমণের সুযোগে তাঁর তিনতলার ঘরটিতে অবাধে প্রবেশ এবং জলের ধারায় স্নান। মনের রাশ না টেনে মুক্তির আনন্দকে ছড়িয়ে দিতেন। ছবির পর ছবি এঁকে চলেছেন স্মৃতির পাতায়,—বাড়ীর ভেতরের বাগানে "শিশিরমাখা ঘাসপাতার গন্ধ" আর শরৎকালের "স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটি" এক অনাস্বাদিত পুলক নিয়ে আসত সেই প্রকৃতি-অন্বেষণী বালকটির মনে। আরও ছিল—গোলা বাড়ি ও রাজার বাড়ি, শেষেরটির অস্তিত্ব মিশে ছিল কল্পনার সঙ্গে। স্মরণ করি 'শিশু' কাব্যের 'রাজার বাড়ি'।

'আমার রাজার বাড়ী কোথায় কেউ জানে না সে তো
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেতো?

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির কথা লিখতে গিয়ে মর্ত্যপ্রেমের মাধুর্য ও আকর্ষণের প্রগাঢ় রূপ তুলে ধরেছেন। প্রজ্ঞাবান কবি রবীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে দেখছেন বার বার সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার শিশুটিকে। কিন্তু বর্ণনায়, বিশ্লেষণে কি গভীর অনুভূতি—"তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কি নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই।" কৌতুক করে বর্ণনা করেছেন, ছোটবেলায় আতার বিচি পুঁতে জল দেওয়া, নকল পাহাড়ে ফুলগাছের চারা লাগানো প্রভৃতি ঘটনা; কিন্তু একদিন "আমাদের গৃহকোণের পাহাড় তাহার গাছপালাসমেত কোথায় অন্তর্ধান করিল।" বাল্যকালের এই খেলার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক কবির যে কৃষি-বিদ্যা নিয়ে কী অপরিসীম আগ্রহ গড়ে উঠেছিল, শান্তিনিকেতনে কৃষিবিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। কবির এই পৃথিবীপ্রেম তাঁর জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত অটুট ছিল। শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির সাহচর্যের জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা, তাঁর সমগ্র জীবনসাধনার মধ্য দিয়ে তৃপ্তি খুঁজে ফিরেছে, বাল্যজীবন থেকেই স্তরে স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে জীবনের বৃহৎ সত্যানুসন্ধানের পথে এগিয়ে গেছে।

কবিতা-রচনা ও নানাবিদ্যার আয়োজন

নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে আমরা অভিহিত করেছি বিশ্বকবি বলে। কিন্তু সেই বিশ্বকবির মনে কবে কবিতারচনার প্রেরণাটি এসেছিল, তার খবর নিয়ে আসে 'জীবনস্মৃতি'। তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এক ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ পয়ার ছন্দে চোদ্দ অক্ষরে কবিতা লেখার পদ্ধতি তাঁকে শেখালেন; তখন তাঁর বয়স সাত বা আট। রবীন্দ্র-জীবনীর গবেষকরা আরও তথ্য দিয়েছেন, তার কিছু উল্লেখ করছি। জ্যোতিঃপ্রকাশের নির্দেশ ছিল পদ্য নিয়ে

কবিতা লেখা। রামায়ণ মহাভারত শুনে অভ্যস্থ কবি সহজেই পয়ারছন্দে শ্লেটে কবিতা লিখলেন। (জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপিতে আরও অতিরিক্ত কিছু জানা যায় (দ্রঃ প্রস্তাবনা অংশ)। মনে হয় এই পদ্মের ওপর কবিতাই তিনি নীলখাতাতে লিখে পড়ে শুনিয়েছিলেন নবগোপালবাবুকে। দাদা সোমেন্দ্রনাথ ভাইএর এই কৃতিত্বের প্রচারক ছিলেন। তবে কাব্যরচনার হাতেখড়ি হল জ্যোতিঃপ্রকাশের উৎসাহে। প্রবল আবেগে নীল কাগজের খাতা ভরে উঠল; ভ্রাতৃগর্বে গর্বিত সোমেন্দ্রনাথের কাজ ছিল শ্রোতা সংগ্রহ করা। নবগোপালবাবু প্রশংসা করলেও ভ্রমরের পরিবর্তে 'দ্বিরেফ' ব্যবহার করার কারণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন। রবীন্দ্রনাথের তাঁকে যথেষ্ট রসগ্রাহী মনে হয়নি। তাঁর মন্তব্য "দ্বিরেফ শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল"।

নর্মাল স্কুলে পড়া, কবিতা লেখার প্রথম পাঠ, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতেও তাঁকে নানাদিকে সুশিক্ষিত করে তোলার আয়োজন হল। "ছিপছিপে বেতের মতো", "মানুষ জন্মধারী" শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয় গৃহশিক্ষক ছিলেন। পড়ানোর সময় ছিল সকাল ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত। তিনি পড়াতেন চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত, মেঘনাদবধ কাব্য। তার আগে ভোরের অন্ধকারে কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করতে হত। স্কুল থেকে ফিরেই ড্রইং ও জিম্‌ন্যাষ্টিক এবং অবশেষে ইংরাজী পড়া। রাত ন'টায় ছুটি হত। প্রাকৃতবিজ্ঞান পাঠ তাঁর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। সন্ধ্যাবেলায় ইংরাজী শিক্ষা মনে হয় না তাঁকে আকৃষ্ট করত। স্মৃতিতে যা রয়েছে সে অনুভূতি হচ্ছে, প্রাতঃকালে নিজের মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করায় আনন্দ অনেক বেশি। যে কোনো ধরণের শিক্ষার সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্তাপন তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই অঘোরবাবুর নিয়মিত ইংরাজী পড়াতে আসায় রবীন্দ্রনাথ মোটেই খুশী হতেন না। স্মরণ করে বলছেন—"সন্ধ্যাবেলায় টিমটিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্মুদূতের উপরও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই।" অস্থিবিদ্যা শিখতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁর মনে আঘাত দিয়েছিল।

এই বহুমুখী শিক্ষাদানের উৎসাহও নজর সবচেয়ে বেশি ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে এই শিক্ষার ভার সুখস্মৃতি হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। তবুও অন্তরের নিভৃতে কবির আত্মসত্তা এক বিপুল কৌতূহল নিয়ে জীবনকে দেখতে চেয়েছে সবধরণের শিক্ষাচর্চাকে অতিক্রম করে।

বাহিরে যাত্রা

একটি শিশুমন কীভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকাশের দিকে এগিয়ে যায়, সেই প্রসঙ্গে এই অংশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আগেই দেখেছি, জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারে বালকদের স্বাধীন বিচরণের অনুমতি ছিল না। ডেঙ্গু রোগের তাড়নায় বাধ্য হয়েই পরিবারের অনেককেই আশ্রয় নিতে হল পেনেটির ছাতুবাবুদের বাগানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন। তিনি একাত্ম হয়ে উঠলেন গঙ্গার সঙ্গে, এক নতুন দৃষ্টি জন্ম নিল। তিনি দেখতেন গঙ্গার ওপর জোয়ার ভাঁটার খেলা, কত নৌকোর বিচিত্র গতিভঙ্গী, সূর্যাস্তের বর্ণশোভা। তাঁর মনে হল, "কড়ি-বরগা-দেয়ালের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।" কবির সমগ্র জীবনেই এই পালাবদল এসেছে বারে বারে। এখানেই তার প্রথম সম্ভাবনা বা সূচনা। গঙ্গার বিশেষ জলরাশি একদিকে, আবার আরেকদিকে ঘাট-বাঁধানো খিড়কির পুকুর, তার চারিদিকে ফলের গাছের আচ্ছাদন—সে দৃশ্য বড়ই আকর্ষনীয় ছিল। "এ যেন ঘরের বধূ"। বড় সুন্দরভাবে শিশু রবীন্দ্রনাথের মনের এক গোপন আন্তরিক ছবি ফুটে উঠেছে। সব কিছুর আড়ালে অবনতমুখী বধূটির মনের গভীরের সবুজ রঙটি যেন রাঙিয়ে তুলেছে তাঁরও মনকে। আবার মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রকৃতি সেই পুকুরটির কাছে নিয়ে যায় বালকচিত্তকে, যেখানে সে দেখতে পাচ্ছে না সহজ দৃষ্টিতে, কল্পনা করছে "যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য"।

রবীন্দ্রনাথের কল্যাণকামী চিন্তার জগতে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় পল্লীগ্রাম। নাগরিক সভ্যতার অন্তরালে মুখ লুকিয়ে থাকা পল্লীগ্রামের পরিচয় কলকাতা শহর নিবাসী রবীন্দ্রনাথ জানতেন না। তাই গ্রামের পথঘাট,

চন্ডীমন্ডপ, খেলাধূলা, এক কথায় সেখানকার জীবনযাত্রা জানতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। একদিন সে সুযোগ এল গোপনে অভিভাবকদের অনুসরণ করে। কিন্তু তাঁরা জানতে পারলেন তাঁর গোপন ভালবাসা এবং যথোপযুক্ত সাজপোষাক না থাকায় শিশুটিকে বাধ্য করা হল ফিরে আসতে। তবে গঙ্গার দৃশ্যে তাঁর চলমান মন পালতোলা নৌকার মতই ভেসে বেড়াত অবিরত। চল্লিশ বছর আগের এই স্মৃতিতে যেন কোথায় বেদনাবোধ বেজে উঠেছে। প্রথম দেখার যে বিস্ময়, যে অনাবিল আনন্দ—যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তাঁরা ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয় মনে নর্মাল স্কুলে যাওয়ার আতঙ্ক নিয়ে।

কাব্যরচনাচর্চা

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনাচর্চা একটি অত্যন্ত সরস বর্ণনা। নীলখাতাটি ক্রমশঃ ভরে উঠছিল। কবির মনে মনে একটু যশপ্রাপ্তির আশাও জেগেছিল। জীবনস্মৃতির এই অংশ থেকেই আমরা জানতে পারি যে তাঁর ক্লাসের শিক্ষক সাতকরি দত্ত মশাই তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য দু' একটি পদ কবিতা দিয়ে সেটি পূর্ণ করে আনতে বলতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে তিরস্কৃত হতেন বার বারই তাঁর কবি খ্যাতি পাওয়ার পরও। কিন্তু এখানে তিনি প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে জানাচ্ছেন যে তাঁর এই বয়সের রচনায় সবটাই সুবোধ্য। একটির পর একটা ঘটনা সাজিয়ে গেছেন তিনি। কীভাবে স্কুলের কঠোর নিয়মবিধির পরিচালক গোবিন্দবাবুর স্নেহলাভ করেছিলেন, তাঁর সুনীতি সম্বন্ধে কবিতা লেখার আদেশপালন ও ক্লাসে উচ্চকণ্ঠে তার আবৃত্তি করেছিলেন, ইত্যাদি নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এটি যথার্থই তাঁর রচনা এই কথা মনে করতে তাঁর সহপাঠিদের মধ্যে বোধ করি কিছু হীনমন্যতা জেগেছিল। ক্লাসের একজন ছাত্র বলল, "যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে।" রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির এইটিই বোধকরি প্রথম অভিযোগ। এইভাবে তিনি নানা কীর্তিকাহিনী বলে গেছেন সরস ভঙ্গীতে।

শ্রীকণ্ঠবাবু

বার্ধক্যে উপনীত এক বহুগুণসম্পন্ন মানুষের যে বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ঐ যুগের প্রেক্ষাপটে সে চরিত্রের মানুষ দুর্লভ। তিনি শ্রীকণ্ঠবাবু—নির্মল স্বভাব, হাস্যোজ্জ্বল উদ্ভাসিত চোখ, ফারসি পড়া মানুষ,কণ্ঠে বিরামহীন সঙ্গীত। তাঁর সব আচরণেই একটা দৃপ্তভঙ্গী প্রকাশ পেত। "সকল মানুষের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধটি নিষ্কণ্টক ছিল। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মিশতে পারতেন তিনি। তিনিও বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎসাহী শ্রোতা ছিলেন। ভবযন্ত্রণা অবলম্বনে তাঁর একটি কবিতা মহা উৎসাহভরে শ্রীকণ্ঠবাবু মহর্ষিকে শুনিয়েছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্রের দুঃসহজীবনজ্বালার পরিচয় পেয়ে তিনি খুব হেসেছিলেন। অপূর্ব ভঙ্গিতে গল্পটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীকণ্ঠবাবু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান সকলকে শুনিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করার অদম্য চেষ্টা ছিল তাঁর। তাঁর ভক্তহৃদয় ব্রহ্মসংগীতের রসমাধুর্যে পূর্ণ থাকত। সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে মহর্ষিকে শোনাতেন—"অন্তরতর অন্তর তুমি যে—ভুলো নারে তাঁয়।" জীবনের অন্তিম লগ্নেও তাঁর কণ্ঠে ছিল—"কি মধুর তব করুণা প্রভো"। শিশু রবীন্দ্রনাথের যে প্রবল আকর্ষণ ছিল এই মানুষটির প্রতি, বিনম্র শ্রদ্ধা নিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছেন।

বাংলা শিক্ষার অবসান

জোড়াসাঁকোর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে বাড়ীর সন্তানদের নানা বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাশিক্ষা, যার অন্তর্গত ছিল পদার্থ বাদ দিয়েই অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা, ভাষাসাহিত্য শিক্ষার পক্ষে 'মেঘনাদবধ' কাব্যপাঠও অতি গুরুপাক হয়েছিল, সন্দেহ নেই। তবুও নর্মাল স্কুলের বাংলাশিক্ষা থেকে তারা অনেক এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁদের বেশিদিন থাকতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ মহর্ষির কাছে এই বইএর জন্য "সাধু গোড়ীয় ভাষায় মেন অনিন্দিত রীতিতে

সে বাক্যবিন্যাস" করেছিল যে দেবেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝেছিলেন যে এই বাংলাভাষা শিক্ষাপদ্ধতি একেবারেই সঠিক নয়, ফলে বাংলাশিক্ষকেরও প্রয়োজনবোধ করলেন না। নীলকমল পণ্ডিতমশাইকে সংবাদটি জানাবার পর তাঁর একটি মন্তব্যকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিধি আলোচনায় যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন। পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে"। সে মূল্য তাঁর মনোভঙ্গীর ভিত্তিস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। তাই শিশুকালে বাংলা পড়া বন্ধ হওয়ার যে নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় তাঁরা অতি আনন্দিত হয়েছিলেন, জীবনের কোমলে কঠোরে ভরা স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—"মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।"

এরপর 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে এক ফিরিঙ্গী স্কুলের ছবি তুলে ধরেছেন। এখানকার অন্যান্য ছেলেদের নানা দৌরাত্ম্য ছিল। কিন্তু তা নিছকই আমোদ, অপমান নয়। নিয়মিত বেতন দেওয়া ছাড়া লেখাপড়ার সঙ্গে বিশে সম্পর্ক ছিল না। ফলে "স্বাধীনতার প্রথম তলাটিতে উঠিয়াছি।" তবুও "ইস্কুল" এমন একটি জায়গা যেখানে "ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই।" দাদাদের ফারসি পড়ানোর শিক্ষক মুনশী, ছায়ার সঙ্গে লাঠি খেলতেন, বেসুরো গলায় গান গাইতেন। তাঁকে তুষ্ট করে প্রায়ই অধ্যক্ষের কাছে জোড়াসাঁকোর কনিষ্ঠ সন্তানের ছুটির আবেদন আসত এবং গ্রাহ্যও হত। এখানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র ও শিক্ষকের একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করে বলছেন যে নির্ঝরের সচলতার মতই বাল্যবয়সের সব অপরাধ চলমানতার সঙ্গে নিঃশেষ হয়। কিন্তু শিক্ষকের ক্ষেত্রে সচেতনতার প্রয়োজন অনেক বেশি সেই জলপ্রবাহকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য এরপর আসছে জাত বাঁচাবার জন্য বাঙালী ছাত্রদের স্বতন্ত্র খাবার ঘরের কথা, রাগরাগিনীর চর্চা, ম্যাজিকের খেলা, ম্যাজিক সম্পর্কে চটি বইএর প্রকাশ ইত্যাদি। তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের বাল্যকালে অঘটন ঘটানোর প্রস্তুতি, তারই রচিত নাটকের ষ্টেজ ছাড়া অভিনয়, আমের আঁটিতে আঠা লাগিয়ে শুকিয়ে গাছ বার করার পরিকল্পনা, বাঁ পায়ে লাফানোর ভুল পদক্ষেপ প্রভৃতি বাল্যস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে স্মরণীয় হয়ে ছিল। স্বভাবের সরলতা, তার বিস্ময়বোধ, তার লাজুক প্রকৃতি সব মিলিয়ে এক বালকের মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে তাঁর স্মৃতির পাতায়।

পিতৃদেব

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবনের প্রথমদিকের অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী, অনেক ভাবনার সূত্র, প্রকৃতির অনাবৃত রূপে অপার আনন্দ, জীবনের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে বিশ্ববোধের জাগরণ প্রভৃতির সংমিশ্রণে এই স্মৃতিচিত্রটি বিশেষ মূল্য বহন করে।

পিতৃদেবের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি জানাচ্ছেন যে দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই দেশভ্রমণে যেতেন; শিশুকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সান্নিধ্য দূরে থাক, পরিচিত ছিলেন না বললেই হয়। মহর্ষির পাঞ্জাবী ভৃত্য লেজু, য়িহুদী গ্যাব্রিয়েলের আতর বেচা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। পাঞ্জাবীরা যোদ্ধার জাত, আর য়িহুদীদের সুদূর বিদেশে বাস—ঘরের চার দেয়ালে বন্ধ কবির মন চলে যেত দূর থেকে আরও দূরে। আবার বিচিত্র পোষাক পরা কাবুলীওয়ালাদের সম্বন্ধে একটা ভীতি থাকলেও কোথায় তাদের ঘিরে এক রহস্য বাসা বাঁধত। পিতার কাছে তাঁর প্রথম লেখা চিঠির একটি সরস গল্প বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি তখন পাহাড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন; গুজব উঠল রাশিয়া ভারত আক্রমণ করবে হিমালয়ের কোনো এক ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে। প্রবল আশংকায় মহর্ষি পত্নী রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁর পিতাকে একটি চিঠি লেখালেন। চিঠি লেখায় অনভিজ্ঞ পুত্র মহানন্দে মুন্সির সাহায্যে সেরেস্তার খাতা লেখার ভাষায় লিখেছিলেন মায়ের আবেদন; উত্তর পেলেন পিতার কাছ থেকে অভয়দানসহ। এই পত্রবিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎই পিতার সম্পর্কে অনেক সহজ হয়ে উঠলেন। বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে তিনি মহর্ষিকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সরস মন্তব্য যে মাশুলের অভাবে "এ চিঠিগুলি হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত পৌঁছে নাই"। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সমস্ত পরিবারকে যে কীভাবে সংহত করে রাখত, সেই চিত্রও বাদ যায়নি তাঁর অল্পদিনের জন্য কলিকাতায়

আগমনবার্তার বিবরণে।

এরপর আসছে তাঁদের তিনটি বালকের উপনয়ন-প্রসঙ্গ। মহর্ষি বেদের মন্ত্র থেকে উপনয়নের মূল বিষয়টি গ্রহণ করেছিলেন। বিশুদ্ধ রীতিতে উপনিষদের মন্ত্র বার বার তাঁদের আবৃত্তি করতে হত। অবশেষে উপনয়ন হল; "মাথা মুড়াইয়া, বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতলার ঘরে তিনদিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম"। উপনয়নের নিয়ম অনুসারে কঠোর সংযম পালন কখনই হত না এবং পুরাণের গল্পে দশবারো বছরের ঋষি বালকদের যে আহুতিদানের গল্প আছে, বালক রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি তাকে প্রামাণ্য বলে মনে করেনি "....কারণ শিশুচরিত্র নামক পুরানটি সকল পুরাণ অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গায়ত্রীমন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করত। তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলেও এই মন্ত্রোচ্চারণে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয়, সেটি তাঁর হৃদয়ের গভীরে বেজে উঠত। এখানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনের পটভূমিতে শিশুমনস্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন।

একটি বালকের মনের তন্ত্রীতে নানা অনুভূতির সুর বেজে ওঠে, কিন্তু সে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। উদাহরণ দিচ্ছেন নিজের জীবন থেকে। গঙ্গার ধারে মেঘোদয়ে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত' আবৃত্তির যে ধ্বনিঝঙ্কার, শিশু রবীন্দ্রনাথ তার অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি, কিন্তু মনের গভীরের একটা ঘুমন্ত আবেগকে যেন নাড়া দিয়েছিল। 'Old curiosity shop' নামে প্রচুর ছবি দেওয়া বইটির কিছু না বুঝেও একটি ছবির মালা গেঁথেছিলেন তাঁর শিশু মন দিয়ে। সংস্কৃত ভাষায় লেখা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হাতে পেয়ে না বুঝেও বাংলা ভাষাপরিচয় থাকায় তাকে বারংবার পড়েছেন, ছন্দ ও কথার মিলন এক আলোড়ন তুলেছিল সেই বালক হৃদয়ে। এই স্মৃতিগুলি থেকে বেরিয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের আজীবনের শিক্ষাচিন্তা, যার একটি বড় অংশ জুড়ে আছে শিশুমন। শুধুমাত্র পরীক্ষার ফল দিয়ে মেধার বিচার হয় না; কারণ জ্ঞানের রাজত্ব অপেক্ষা ভাবের রাজত্বে বিচরণই শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দিকটি ভাল করে ভাবার প্রয়োজন আছে। "শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া"। মনের সঙ্গে সংযোগসাধন না হলে শিক্ষা সত্য হয় না। তিনি জ্ঞানী পণ্ডিতদের থেকেও দেশীয় কথকদের কথকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন; কারণ ভাষা, তত্ত্বকথাকে অতিক্রম করে তাঁদের বলার ভঙ্গীতে শ্রোতা সব না বুঝেও কিছু একটা হৃদয়ঙ্গম করে। সেই আভাসই ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ ছবি হয়ে ওঠে পরিণতমননে। যুক্তিতে বুদ্ধিতে সব সময়ে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত হয় না।

'পিতৃদেব' অংশে পিতার কথা সামান্যই আছে। কিন্তু তিনি যে উপনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই ক্রিয়াকর্মের অনুভূতি থেকেই বালক রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের এবং সেইসঙ্গে তাঁর পরিণত চিন্তাভাবনার এক সুসংবদ্ধ রূপ দেখতে পাই।

হিমালয় যাত্রা

এই অংশে পিতৃদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নিবিড় সান্নিধ্যের চিত্র রয়েছে। উপনয়নের পর মুন্ডিত মস্তকে স্কুলে গিয়ে কি অভ্যর্থনা জুটবে, সেই আশংকায় চিন্তিত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক অভাবনীয় প্রাপ্তিযোগ এল সেইসময়ে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে হিমালয় যাত্রার সঙ্গীরূপে নিলেন। পিতার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ করতে গিয়ে তা উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে কনিষ্ঠ পুত্রের চোখে। তিনি বলছেন, মহর্ষির সকল কাজেরই একটা সুচিন্তিত পদ্ধতি ছিল। তিনি নিজে যেমন নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, অপরের ক্ষেত্রে সেই আচরণই আশা করতেন। তিনি অভিজ্ঞ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপটি তিনি তাঁর মনের মধ্যে গঠন করে নিতেন। তাই তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনাতেই যে সংসার পরিচালিত হবে, এ অধিকার অতি সঙ্গতভাবেই তাঁর ছিল। তাঁর সুপরিকল্পনায় প্রত্যেকটি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে, কোথাও ব্যতিক্রম ঘটবে না—এইটিই তিনি আশা করতেন। নানা মানুষের বর্ণনাকে তিনি মনের মধ্যে পর পর যুক্ত করে ঘটনাটি উপলব্ধি করতেন। কোথাও শৈথিল্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ